সাহিত্যানুশীলন

উচ্চ মাধ্যমিক সাহিত্য সংকলন

বাংলা ক | একাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

সাহিত্যানুশীলন

উচ্চ মাধ্যমিক সাহিত্য সংকলন

বাংলা ক । একাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে একাদশ শ্রেণির
ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।
বিক্রয়যোগ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

সাহিত্যানুশীলন

একাদশ শ্রেণি

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০২৪

প্রকাশক : ড. প্রিয়দর্শিনী মল্লিক
সচিব
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ
বিদ্যাসাগর ভবন, ৯/২, ব্লক-ডি জে
সেক্টর-II, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০০৯১

কপিরাইট পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক সংরক্ষিত। মাননীয়া সচিব, ড. প্রিয়দর্শিনী মল্লিক মহাশয়ার লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ / পুনর্মুদ্রণ / স্ক্রিপ্ট ব্যবহার / হরফ অনুবাদ করা যাবে না।

মুদ্রণ
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে **সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে **সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম** এবং **উপাসনার স্বাধীনতা; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা** এবং তাদের সকলের মধ্যে **ব্যক্তির মর্যাদা** এবং **জাতীয় ঐক্য** ও **সংহতি** সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে **ভ্রাতৃত্বের ভাব,** গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, **আমাদের গণপরিষদে,** আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই **সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ** এবং **নিজেদের অর্পণ** করছি।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC AND TO SECURE TO ALL ITS CITIZENS :**

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকার (ভারতীয় সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)

১. সাম্যের অধিকার

● আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;

● জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না;

● সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার থাকবে;

● অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা-আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এবং

● উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২. স্বাধীনতার অধিকার

● বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার;

● শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;

● সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার;

● ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার;

● ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার;

● যে-কোনো জীবিকার, পেশার বা ব্যাবসাবাণিজ্যের অধিকার;

● আইন অমান্য করার কারণে অভিযুক্তকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে;

● একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না;

● কোনো অভিযুক্তকে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না;

● জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার;

● যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না; এবং আটক ব্যক্তিকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

● কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না;

● চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

● প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে;

● প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সংস্থা স্থাপন এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে;

● কোনো বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে করদানে বাধ্য করা যাবে না;

● সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং সরকারের দ্বারা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার

● সব শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে;

● রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাত বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না;

● ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৬. শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

● মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকেরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ নং ধারা)

১। সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

২। যেসব মহান আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ;

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ;

৪। দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া;

৫। ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশসাধন এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহকে বর্জন;

৬। আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যদান ও সংরক্ষণ;

৭। বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসাধন এবং জীবন্ত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ব পোষণ;

৮। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারসাধন;

৯। সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন;

১০। সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নপ্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন; এবং

১১। ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

ভূমিকা

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ দীর্ঘ বারো বছর বাদে সমস্ত বিষয়ে পাঠক্রম পরিমার্জন ও পরিবর্তনের পদক্ষেপ নিয়েছে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এবং এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশিত সাহিত্যানুশীলন সংকলনটি নবকলেবরে পরিবেশন করা হল। সর্বসিদ্ধান্তমতে সংসদ ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে 'সেমিস্টার সিস্টেম' প্রবর্তন করেছে। নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রকাশিত 'সাহিত্যানুশীলন' সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করানো। আমাদের সেই উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই সংকলনের মাধ্যমে শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যেরও আস্বাদ পাচ্ছে। এখানে গতানুগতিকতা বা একঘেয়েমি এড়াতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। একই মলাটের মধ্যে আনা হয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা অর্থাৎ গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, বড়ো গল্প ইত্যাদি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসুর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরের অনুদানে এই বইটি ২০২৪ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

সংকলনটিতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসৃত হয়েছে। সংকলনটি প্রকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মে, ২০২৪
বিদ্যাসাগর ভবন

ডঃ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

CLASS-XI

SEMESTER-I

SUBJECT : BENGALI-A (BNGA)

FULL MARKS : 40 CONTACT HOURS : 90 Hours

COURSE CODE : THEORY

(MCQ Type Questions)

TOPICS	CONTACT HOURS	MARKS
গল্প	10	08
প্রবন্ধ	09	05
কবিতা	12	07
আন্তর্জাতিক গল্প ও ভারতীয় কবিতা	12	05
ভাষা	22	10
বাংলা শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস	25	05

CLASS-XI

SEMESTER-II

SUBJECT : BENGALI-A (BNGA)

FULL MARKS : 40 CONTACT HOURS : 60 Hours

COURSE CODE : THEORY

(SAQ and LAQ Type Questions)

TOPICS	CONTACT HOURS	MARKS
গল্প	10	05
কবিতা	09	05
নাটক	06	05
পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ	12	10
বাংলা শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস	13	05
প্রবন্ধ রচনা	10	10

PROJECT

CLASS-XI

FULL MARKS : 20 CONTACT HOURS : 30 Hours

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ড. জয়দীপ ঘোষ
ড. মৌসুমী মল্লিক
শ্রীমতী লক্ষ্মী দত্ত বনিক
শ্রীমতী ঋতা মুখার্জী

প্রচ্ছদ

সুব্রত মাজী

সূচিপত্র

বাংলা ক

একাদশ শ্রেণি

সেমিস্টার - I

গদ্য -		**পৃষ্ঠা**
পুঁইমাচা	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
প্রবন্ধ -		
বিড়াল	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৪
কবিতা -		
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮
সাম্যবাদী	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯
আন্তর্জাতিক গল্প -		
বিশাল ডানাওয়ালা এক থুত্থুরে বুড়ো	গ্যাব্রিয়াল গারসিয়া মার্কেজ (অনুবাদ-মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)	২১
ভারতীয় কবিতা -		
চারণ কবি	ভারভারা রাও (অনুবাদ-শঙ্খ ঘোষ)	২৮

সেমিস্টার - II

গল্প -		**পৃষ্ঠা**
ছুটি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩১
তেলেনাপোতা আবিষ্কার	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪০
কবিতা -		
ভাব সম্মিলন	বিদ্যাপতি	৪৮
লালন শাহ ফকিরের গান	লালন শাহ	৪৯

নুন	জয় গোস্বামী	৫০

নাটক -

আগুন	বিজন ভট্টাচার্য	৫১

পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ -

পঞ্চতন্ত্র	সৈয়দ মুজতবা আলি	
● বই কেনা		৬২
● আজব শহর কলকেতা		৬৭
● পঁচিশে বৈশাখ		৬৯
● আড্ডা		৭২

পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি ৮১

একাদশ শ্রেণি

প্রকল্প

প্রকল্প-২০ (প্রুফ সংশোধন (০৫) প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে)-

- **প্রুফ সংশোধন-** একটি অনুচ্ছেদ দেওয়া হবে তার থেকে বিরাম চিহ্ন, সম্পাদনা, অনুচ্ছেদ বিভাজন, বানান, শিরোনাম-এই বিষয়গুলির সম্ভাব্য ভুলত্রুটি সংশোধন করতে হবে।

সটীক অনুবাদ -

- মূল ভাষা থেকে অনুবাদ করতে হবে। ১০০০-৩০০০ শব্দের মধ্যে। সময়সীমা-৬ মাস।
- অনুবাদ করা যাবে- (ক) প্রবন্ধ (খ) চিঠি (গ) ঐতিহাসিক নথি (ঘ) গল্প এবং (ঙ) নাটক। (লেখক এবং লেখা সম্পর্কে টীকাসহ অনুবাদ করতে হবে)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ -

- লোকায়ত আঙ্গিক / সাহিত্য / রাজনীতি / ক্রীড়া / নাচ / গান / কলা ক্ষেত্রের যে-কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের (অন্তত জেলাস্তরে পরিচিতি থাকতে হবে) সাক্ষাৎকার নিতে হবে। অন্তত ২০টি প্রশ্ন।

প্রতিবেদন রচনা -

- ছ'মাসের দৈনিক সংবাদপত্রের খেলার পাতার কাটিং সংগ্রহ এবং তার ভিত্তিতে নিজের দেশ বা রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে উত্থানপতন বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন লিখতে হবে। নূন্যতম শব্দ সংখ্যা-১০০০।

স্বরচিত গল্প লিখন- বিদ্যালয় জীবনের কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে (মৌলিক) এক বা একাধিক স্বরচিত গল্প লিখতে হবে।

সেমিস্টার-I

পুঁই মাচা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়হরি চাটুজ্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন — একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তেলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতে ছিলেন, স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেন না, এমনকি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন— কি হয়েছে, বসে রইলে যে? দাও না একটি ঘটি? আঃ, ক্ষেন্তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন — তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার? স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল — ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আমতা আমতা করিয়া কহিলেন— কেন...কি আবার...কি...

অন্নপূর্ণা পূর্বাপেক্ষাও শান্ত সুরে বলিলেন - দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি ন্যাকামি করতে হয় অন্যসময় কোরো। তুমি কিছু জান না, কি খোঁজ রাখ না? অত বড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধরে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি করে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন — কেন? কি গুজব?

— কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ি। কেবল বাগদী দুলে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না। সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ববৎ সুরেই পুনর্বার বলিয়া উঠিলেন— একঘরে করবে গো, তোমাকে একঘরে করবে কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হলো না — ও নাকি উচ্ছ্বগগু করা মেয়ে — গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ বলবে না — যাও ভালোই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী বাগদী-বাড়ী উঠে-বসে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন — এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকি আছেন কালীময় ঠাকুর! — ওঃ!

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন — কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশি কিছু লাগে। নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা, না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই, চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি? — আর সত্যিই তো, এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল। হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন — হলো যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে বলে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?... পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন— না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রী সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কী দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন — কিন্তু খিড়কী দুয়ারে একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন — এ সব কি রে? ক্ষেন্তি-মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ও! এ যে...

চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর-দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিলা তাহার হাতে এক বোঝা পুঁই শাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হলদে, হলদে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই-গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল, মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে। ছোট মেয়ে দুটির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পাকা পুঁই-পাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো কৃষ্ণ ও অগোছালো বাতাসে উড়িতেছে, মুখোনা খুব বড়, চোখ দু'টো ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলো দু'পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুঁই পাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল — চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া বুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে — তোমার বাবার কাছে আর-দিনকার দরুন দু'টো পয়সা বাকি আছে আমি বললাম — দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে — আর এই পুঁই শাকগুলো ঘাটের ধারে রায় কাকা দিয়ে বললে, নিয়ে যা — কেমন মোটা মোটা...

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতে অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চিৎকার করিয়া উঠিলেন — নিয়ে যা, আহা কি অমর্তই তোমাকে তারা দিয়েছে! পাকা পুঁইডাঁটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পরে ফেলে দিত...নিয়ে যা, আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন—ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট করে কাটতে হলো না যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে...ধাড়ী। মেয়ে, বলে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে পাড়া করে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?... কোথায় শাক, কোথায় বেগুন আর একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ,... ফেল বলছি ওসব... ফেল!.....

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে মা'র দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁই শাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন — যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো... ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং খোঁড়া না করি তো...।

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মত সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কী অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অতবড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল ...সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আমতা আমতা করিয়া বলিতে গেলেন — তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে বলে... তুমি আবার... বরং... পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না — মেয়ে মানুষের আবার অত নোলা কিসের! এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে করে! যা, যা... তুই যা, দূর করে বনে দিয়ে আয়...।

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস হোক, পুঁই শাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুরবেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না — নিঃশব্দে খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল— গত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়ীতে পুঁই শাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল—মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের...

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কী দোরের আশেপাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—বাকিগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারে ছাইগাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারি রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু-এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন— কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীমায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন— সে-সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধর, কেষ্ট মুখুয্যে...স্বভাব নইলে পাত্র দেব না, স্বভাব নইলে পাত্র দেব না করে কি কাণ্ডটাই করলে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে পড়ে মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে! তার কি স্বভাব? রাম বলো, ছ'সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রিয়!

পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন— তা সমাজের সে-সব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চলে যাচ্ছে। বেশি দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের...

সহায়হরি বাধা দিয়ে বলিতে গেলেন— এই শ্রাবণে তেরোয়...

—আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক, তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো এরকম উচ্চগুচ্ছ করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত পাকের যা বাকি, এই তো?... সমাজে বসে এ-সব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা বসে বসে দেখব এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেল...পাত্তর পাত্তর, রাজপুত্তুর না হলে পাত্তর মেলে না? গরীব মানুষ, দিতে-থুতে পারবে না বলেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক করে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলো, জজ মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস—রাজার হাল! দুই ভায়ের অভাব কি?...

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথাব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্যন্ত বাকি — শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হোক পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি কয়েক মাস পূর্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকারবধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এরকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙিগয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবী লেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল—বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল...।

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন — যা শিগগির, শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি! কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন। এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটা লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল— তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল — ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারো ঘরে সিঁধ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন — মুখুয্যে বাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল— খুড়ীমা, মা বলে দিলে খুড়ীমাকে গিয়ে বল, মা ছোঁবে না তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার করে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে বাড়ী ও-পাড়ায়—যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন বন শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজঝোলা হলদে পাখী আমড়া গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—খুড়ীমা, খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখিটা। পাখি দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ খুপ করিয়া আওয়াজ হইতেছিল... কে যেন কি খুঁড়িতেছে... দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার খানিকদূর যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ খুপ শব্দ আরম্ভ হইল। কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন— এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই যে যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো-ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ও-পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে— কর্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আস না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু করে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং...

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বরোজপোতার বনের মধ্যে বসে খানিক আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন—আমি। না...আমি কখন? ...কক্ষনো না, এই তো আমি... সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না। আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি...দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও-পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ খুপ শব্দ...তখনি আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ... তোমার তো হইকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা করতে ইচ্ছে হয় কর কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন কবিবার চেষ্টা করিতে গেলেন, কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশি কথাও যোগাইল না, বা

কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না...

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন— ক্ষেন্তি, এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা...

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতস্তত করিতে করিতে মা'র নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস, না?

ক্ষেন্তি মা'র মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মা'র মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন— কথা বলছিস নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কি না? ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মা'র মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল— হ্যাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন— পাজী, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছে মেটে আলু চুরি করতে! সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন কালে, সেই একগলা বিজন বন, যার মধ্যে দিনদুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তা মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে? যদি গোঁসাইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা বলে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব মা?

দু-তিন দিন পরে একদিন বৈকালে, ধূলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল—মা মা, দেখবে এস...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন ভাঙ্গা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলো পাথরকুচি ও কন্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থিবন্ধ হইয়া ফাঁসি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন উধ্বমুখে একখণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাতত তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন—দূর পাগলী, এখন পুঁই ডাঁটার চারা পোঁতে কখনো। বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে মরে যাবে।

ক্ষেন্তি বলিল—কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখ, হয়তো বেঁচে যেতেও পারে। আজকাল রাতে খুব শিশির হয়। খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে।...একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে

কাঁপিতে মুখুয্যে বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন—হ্যাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জমাটা গায়ে দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত?

—আচ্ছা দিচ্ছি বাবা— কই শীত, তেমন তো...

— হ্যাঁ, দে মা, এক্ষুনি দে— অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে, বুঝলি নে?— সহায়হরি বহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?...

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিত রূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিফু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুন জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি রাখিতেন না। জামার বর্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না — ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গের মধ্যে উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটি কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতে ছিলেন— একটা ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনীর নীচে একটা কলার পাত পাড়িয়া এক থালা নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনেবাদারে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়চোপড় শাস্ত্রসম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুষ্ক কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধী হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল—মা, ঐ একটু...

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধীর প্রসারিত হাতের উপর দিলেন, মেজমেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া মা'র সামনে পাতিয়া বলিল—মা, আমায় একটু...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন— দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্য একটু রাখি ক্ষেন্তি ক্ষিপ্ত হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানে সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশি করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজমেয়ে পুঁটি বলিল — জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল — এ-বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ও-বেলা ব্রাহ্মণ নেমতন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও-বেলা তো পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি এইসব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল— হ্যাঁ মা, ক্ষীর নইলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেদী বলছিল, ক্ষীরের পুর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম, কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়েই করে, সে তো কেমন ভালো লাগে।

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন। ক্ষেন্তি বলিল— খেদীর ওই সব কথা! খেদীর মা তো ভারী পিঠে করে কিনা! ক্ষীরের পুর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হলো? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ... আর পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপটা ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়!

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মা'র চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল— মা, নারকেলের কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন— নে, কিন্তু এখানে বসে খাস নো মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থাবা তুলিয়া লইয়া একটু দুরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণ স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন— ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি, গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল-দেওয়া ভাত আছে ও-বেলার, বার করে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল— মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালোবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই মেজো মেয়ে পুঁটি খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্টি খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে। সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো-উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন— ক্ষেন্তি, আর নিবি? ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মা'র দিকে চাহিয়া বলিল— বেশ খেতে হয়েছে মা ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নাও, ওতেই কিন্তু... সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তী, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন— ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজ কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টু শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হইবে না। তবুও

প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ী, সিলেট চুন ও ইটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘটনা কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশি, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন— চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ির বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।...তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?...

যাইবার সময়ে ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল— মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো... বাবাকে পাঠিয়ে দিও... দু'টো মাস তো...

ও-পাড়ার ঠানদিদি বলিলেন— তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক— তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুয়েমি সুরে বলিল না, যাবে না বৈ কি!... দেখো তো কেমন না যান...

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকালবেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু-হু করিত... তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে— মা, বলব একটা কোথা? ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি...

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন— ও তুমি ধরে রাখ, ওরকম হবেই দাদা আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন— নাঃ, সব তো আর... তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব। ...তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুকাটায় পাঁচ-ছ'টি টান দিয়া কাসিতে কাসিতে বলিলেন— বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল, বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

—একেবার চামার...

—তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পুজোর তত্ত্ব কম করেও ত্রিশটে টাকার কমে হবে না ভেবে দেখলাম কিনা? মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে... ছোটলোকের মেয়ের মতন চলে, হাভাতে ঘরের মত খায়... আরও কত কি। পৌষ মাসে দেখতে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে...

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে মিনিট কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের কোনো কথা শুনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন— তারপর?

— আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! শাশুড়িটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনে শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করলেই এরকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিনে মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে! পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন— বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুচির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে— আজই না হয় আমি প্রাচীন... আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থনসূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

—তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হলো। এমন চামার— বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল— তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে...

—দেখতে পাওনি?

নাঃ! এমনি চামার— গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ...যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলা গেল। ...চার কি ঠিক করলে? ...পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না।...

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাকলি পিঠের জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটি ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে— আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন করে ফেললে কেন?

পুঁটি বলিল— আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

— ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে এক্ষুনি ধরে উঠবে...

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন— সরে এসে বোসো মা, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয় গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল... খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন... দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।...

পুঁটি বলিল— মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কানাচে ষাঁড়া ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন— একা যাস নে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে ষাঁড়াগাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে। ...

পুঁটি ও রাধী খিড়কী দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস খস করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠেখানা জোর করিয়া ছুড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কী- দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।...

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন— দিলি?

পুঁটি বলিল— হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিল সেখানে ফেলে দিলাম...

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে...রাতও তখন খুব বেশি...জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক-র-র-র শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে... দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল— দিদি বড় ভালবাসত...

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পরে তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল... সেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে... বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে...সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : (১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪-১ নভেম্বর, ১৯৫০) ছিলেন একজন জনপ্রিয় **ভারতীয় বাঙালি** সাহিত্যিক। বিভূতিভূষণ **পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার** কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্তী ঘোষপাড়া-মুরাতিপুর গ্রামে নিজ মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। **পথের পাঁচালী** ও **অপরাজিত** তাঁর সবচেয়ে বেশি পরিচিত উপন্যাস। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে **আরণ্যক, চাঁদের পাহাড়, আদর্শ হিন্দু হোটেল, ইছামতী** ও **অশনি সংকেত** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের পাশপাশি বিভূতিভূষণ প্রায় ২০টি গল্পগ্রন্থ, কয়েকটি কিশোরপাঠ্য উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনি এবং দিনলিপিও রচনা করেন। বিভূতিভূষণের **পথের পাঁচালী** উপন্যাস অবলম্বনে **সত্যজিৎ রায়** পরিচালিত চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। বিভূতিভূষণের অধিকাংশ উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে **ইছামতী** উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণ পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার **রবীন্দ্র পুরস্কার** (মরণোত্তর) লাভ করেন।

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমি শয়ন গৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া হুঁকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে— দেওয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই— এ জন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্ হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটু ক্ষুদ্র শব্দ হইল, ‘‘মেও!’’

চাহিয়া দেখিলাম— হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভালো নহে। ডিউক বলিল, ‘‘মেও!’’

তখন চক্ষু চাহিয়া ভালো করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, ‘‘মেও!’’ বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, ‘‘কেহ মরে বিল ছেঁচে কেহ খায় কই।’’ বুঝি সে ‘‘মেও’’ শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, ‘‘তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি— এখন বল কী?’’

বলি কী? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কী জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, ‘‘মেও!’’ প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া

যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, ''মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে— আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলে তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তেমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপয়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

''দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কী? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল— অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী— আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

''দেখ আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে— চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?''

''দেখ আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নরদামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয়না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কী প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে, তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মতো দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না— সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?''

''দেখ যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশি? তা ত নয়— তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্যজাতির রোগ— দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর— আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর— ছি! ছি!''

''দেখ আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমার চারিদিক্ দৃষ্টি করিতেছি— কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ

তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল— গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল— তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।"

"আর আমাদিগের দশা দেখ— আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে— জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে— অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "মেও! মেও! খাইতে পাই না!" আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও— নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী; কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে খাইয়া তাহার যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জার পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জার বলিল, "না হইল ত আমার কী? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কী ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল! যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।"

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়াদেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মতো এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ

আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে— আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।"

মার্জার বলিল, ''আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬ জুন ১৮৩৮ - ৮ এপ্রিল ১৮৯৪) ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট **বাঙালি** ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় বর্তমান **উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটি** শহরের নিকটস্থ কাঁঠালপাড়া গ্রামে। বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে তাঁর অসীম অবদানের জন্যে তিনি **বাংলা সাহিত্যের** ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁকে সাধারণত প্রথম আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে **গীতার** ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে, সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও তিনি বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি জীবিকাসূত্রে **ব্রিটিশ রাজের** কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যপত্র **বঙ্গদর্শনের** প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তৎকালীন সময়ের প্রথা ও সংস্কার আন্দোলন, হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান, হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাত, প্রগতিশীল ভাবধারার অভাব, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রাধান্য প্রভৃতি হল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আর্থসামাজিক পটভূমিকা এবং এই পটভূমিকাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু! — উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩) : জন্ম বাংলাদেশের যশোর জেলার সাগরদাঁড়িতে। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়েই ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৮৪৩ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টি শুরু করে মধুসূদন black verse-এর অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা কাব্যে যুগান্তর আনেন। গ্রিক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল মেঘনাদবধ কাব্য। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, মায়াকানন, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ও একেই কি বলে সভ্যতা নামে দুটি প্রহসন রচনা করেন।

সাম্যবাদী

কাজী নজরুল ইসলাম

গাহি সাম্যের গান —
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রিশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি? — পার্সি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কন্‌ফুসিয়াস্? চার্বাক— চেলা? বলে যাও, বল আরও!
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থ-সাহেব পড়ে যাও যত সখ,-
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি? — পথে ফোটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!
বন্ধু, বলিনি ঝুট,

এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) : বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা মুক্তি প্রকাশিত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'সাপ্তাহিক বিজলী' পত্রিকার ৬ জানুয়ারি সংখ্যায় বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এবছরই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' এবং প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়। কবি তাঁর কবিতায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে অগ্নিবীণা, চক্রবাক, চিত্তনামা, ছায়ানট, জিঞ্জীর, ঝড়, দোলনচাঁপা, নতুন চাঁদ, নির্ঝর, পুবের হাওয়া, প্রলয়শিখা, ফণীমনসা, বিষের বাঁশি, সর্বহারা, সাম্যবাদী প্রভৃতি। 'সঞ্চিতা' তাঁর কবিতার এক অসামান্য সংকলন। সওগাত, মোসলেম ভারত, নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙল প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রকাশিত হয়। বাংলা গানের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অপরিসীম।

বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

বৃষ্টির তৃতীয় দিনে ওরা বাড়ির ভেতরে এতই কাঁকড়া মেরেছিল যে পেলাইওকে ভিজে-একশা উঠোন পেরিয়ে গিয়ে সেগুলোকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিতে হয়েছিল, কারণ সারা রাত ধরে নবজাত শিশুটির ছিল জ্বর, আর ওরা ভেবেছিল জ্বরটা হয়েছে ওই পচা বদ গন্ধটার দরুন। মঙ্গলবার থেকেই সারা জগৎ কেমন বিষণ্ণ হয়ে আছে। সমুদ্র আর আকাশ হয়ে উঠেছে একটা ছাই-ধূসর বস্তু; আর বেলাভূমির বালি, মার্চের রাত্তিরে যা ঝকঝক করে গুঁড়ো-গুঁড়ো আলোর মতো, হয়ে উঠেছে কাদা আর পচা খোলকমাছগুলোর এক ভাপে-সেদ্ধ-হওয়া দগদগে স্তূপ। দুপুরবেলাতেই আলো এমন দুর্বল যে পেলাইও যখন কাঁকড়াগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরছিল, তার পক্ষে দেখাই মুশকিল ছিল উঠোনের পেছন কোণটায় কী-সেটা ছটফট করে নড়তে-নড়তে কাতরাচ্ছে। তাকে খুব কাছে গিয়ে তবেই দেখতে হয়েছিল যে এক বুড়ো, খুবই থুরথুরে বুড়ো, কাদার মধ্যে মুখ গুজে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, আর তার প্রচণ্ড সব চেষ্টা সত্ত্বেও, কিছুতেই উঠতে পারছে না, তার বিশাল দুই ডানায় কেবলই বাধা পেয়ে যাচ্ছে।

সেই দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠে, পেলাইও ছুটে চলে গেল এলিসেন্দার কাছে, তার বউ, যে তখন অসুস্থ বাচ্চাটির কপালে জলপট্টি দিচ্ছিল, আর পেলাইও তাকে ডেকে নিয়ে গেল উঠোনের পেছন কোণায়। পড়ে-থাকা শরীরটার দিকে তাকিয়ে তারা কেমন হতভম্ব হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বুড়োর পরনে ন্যাকড়াকুড়ুনির পোশাক। তার টাক-পড়া চকচকে মাথাটায় কয়েকটাই মাত্র বিবর্ণ চুল রয়েছে, ফোগলা মুখটায় খুবই কম দাঁত, আর এককালে যদি বা তার কোনো জাঁকজমক থেকেও থাকত এখন এই ঝোড়ো কাকের প্র-প্রপিতামহের করুণ দশা সে জাঁকজমক একেবারে উধাও করে দিয়েছে। তার অতিকায় শিকারি পাখির ডানা—নোংরা, আদ্ধেকটাই পালক খসা—চিরকালের মতো কাদায় জট পাকিয়ে গিয়েছে। ওরা তার দিকে এতক্ষণ ধরে খুব কাছে থেকে হাঁ করে তাকিয়েছিল যে পেলাইও আর এলিসেন্দা খানিক বাদেই তাদের প্রথম চমকটা জয় করে নিলে, বরং শেষটায় একে বেশ চেনা-চেনাই ঠেকল। তখনই সাহস করে তার সঙ্গে কথা কইবার একটা চেষ্টা করলে তারা, আর উত্তরে সে খালাশিদের যেমন গলা ফাটিয়ে কথা বলার অভ্যেস থাকে তেমনি রিনরিনে গলায় কী-এক দুর্বোধ্য বুলিতে জবাব দিলে। ওই কারণেই ওরা ডানাদুটোর ঝামেলা-টামেলাকে বেমালুম কোনো পাত্তা না দিয়েই বেশ বুদ্ধিধারীদের মতোই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে সে নিশ্চয়ই তুফানে উলটে যাওয়া কোনো ভিনদেশি জাহাজের নিঃসঙ্গ ভরাডুবি নাবিক। অথচ তবু তাকে দেখাবার জন্যে ওরা এক পড়োশিনিকে ডেকে আনলে, সে আবার জীবনমৃত্যুর সব গলিঘুঁজিরই হদিস

রাখে; আর তার দিকে শুধু একবার তাকিয়েই সেই পড়োশিনির ওদের বোঝাতে দেরি হল না যে ওরা একটা মস্ত ভুল করেছে।

'এ যে এক দেবদূত', পড়োশিনি তাদের বললে। 'নিশ্চয়ই বাচ্চাকে নিয়ে যেতে আসছিল, কিন্তু বেচারা এমনই বুড়োহাবড়া যে এই মুষলবৃষ্টি তাকে একেবারে পেড়ে ফেলেছে।'

পরের দিনই সবাই জেনে গেল যে পেলাইওদের বাড়িতে এক রক্তমাংসের জ্যান্ত দেবদূতকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে। জ্ঞানে ঝুনো ওই পড়োশিনির বিচারবুদ্ধিকে কোনো পাত্তা না দিয়ে—তার কাছে তখন দেবদূতমাত্রেই কোনো স্বর্গীয় ষড়যন্ত্রের পালিয়ে-বাঁচা নিদর্শন—ওরা তাকে মুগুরপেটা করে মেরে ফেলতে কোনো সায় পেলে না। রান্নাঘর থেকে পেলাইও সারা বিকেল তার ওপর নজর রাখলে, তাদের পালের খাটো মুগুরটায় সে সশস্ত্র; আর রাত্তিরে শুঁতে যাবার আগে তাকে সে কাদা থেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে তারের জাল ঘেরা মুরগির খাঁচাটায় বন্ধ করে রাখলে। মাঝরাত্তিরে, বৃষ্টি যখন ধরে এল, পেলাইও আর এলিসেন্দা তখনও একটার পর একটা কাঁকড়া মারছে। একটু বাদেই বাচ্চাটাও জেগে উঠল মস্ত এক খাই-খাই নিয়ে, তার গায়ে আর জ্বর নেই। তখন ওরা একটু দরাজদিল হয়ে উঠল, ঠিক করলে যে এই দেবদূতকে ওরা তিনদিনের উপযোগী টাটকা জল আর খাবারদাবার দিয়ে একটা ভেলায় করে বারদরিয়ায় তার নিয়তির কাছে ছেড়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু উষার প্রথম আলো ফোটবামাত্র যখন ওরা উঠোনে গিয়ে হাজির হল, ওরা দেখতে পেলে পুরো পাড়াটাই মুরগির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে দেবদূতকে নিয়ে মজা করছে, রঙ্গতামাশা করছে, কারু মধ্যে কোনো সম্ভ্রমবোধ নেই, তারের মধ্যে দিয়ে তাকে ছুড়ে-ছুড়ে দিচ্ছে খাবার, যেন সে আদপেই কোনো অতিপ্রাকৃত জীব নয়—বরং যেন সে এক সার্কাসের জন্তু।

সকাল সাতটার আগেই পাদ্রে গোনসাগা এসে হাজির—এই অদ্ভুত খবরে বেশ শঙ্কিত হয়েই হন্তদন্ত হয়ে তিনি ছুটে এসেছেন। ততক্ষণে ভোরবেলাকার দর্শকদের মতো তত রঙবাজ নয় এমন দর্শকরা এসে হাজির হয়েছে, আর তারা বন্দির ভবিষ্যৎ নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সরল লোকটা ভেবে ফেলেছে যে একে সারা জগতের পুরপিতা নাম দেওয়া উচিত। অপেক্ষাকৃত কঠিন হৃদয়ের লোকেদের মনে হল একে এক পাঁচতারা সেনাপতির পদে উন্নীত করে দেওয়া হোক, যাতে সে সব যুদ্ধবিগ্রহই জিতিয়ে দিতে পারে। কিছু-কিছু দূরদর্শীর মনে হল তাকে দিয়ে যদি পৃথিবীতে কোনো ডানাওয়ালা জাতির জন্ম দেওয়ানো যায় তবে সে জাতি হবে জ্ঞানে-গুণে সবার সেরা, আর তারাই তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দায়িত্ব নিয়ে নেবে। কিন্তু পাদ্রে গোনসাগা, যাজক হবার আগে ছিলেন এক হট্টাকট্টা কাঠুরে—তারের বেড়ার পাশে দাড়িয়ে, তিনি মুহূর্তে জেরা করবার জন্যে প্রশ্নোত্তরে সব ভেবে নিলেন, আর ওদের বললেন দরজাটা খুলে দিতে, যাতে ভেতরে গিয়ে কাছে থেকে তিনি এই হতশ্রী করুণ লোকটাকে দেখে নিতে পারেন—যাকে তখন এই ভ্যাবাচাকা-খাওয়া মন্ত্রমুগ্ধ মুরগির ছানাগুলো মধ্যে এক অতিকায় জরাজীর্ণ মুরগির মতো দেখাচ্ছিল। সে শুয়ে আছে এক কোণায়, খোলা ডানাগুলো সে শুকোচ্ছে রোদ্দুরে, চারপাশে ছড়িয়ে আছে ফলের খোসা আর ছোটোহাজরির উচ্ছিষ্ট, ভোর ভোর ওঠা দর্শকরা এসে যেসব তাকে ছুড়ে দিয়েছে। পাদ্রে গোনসাগা যখন মুরগির খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে লাতিনে সুপ্রভাত জানালেন,

জগতের ধৃষ্টতা আর ঔদ্ধত্য তার অচেনা বলে সে শুধু তার প্রত্নপ্রাচীন চোখ তুলে গুনগুন করে কী একটা বললে তার ভাষায়। এ যে এক জোচ্চোর ফেরেববাজ, এবিষয়ে এ তল্লাটের যাজনপল্লির এই পুরুতটির মনে প্রথম সন্দেহটা দানা বেঁধে উঠল, বিশেষত যখন দেখতেই পেলেন যে এ ঈশ্বরের ভাষাই বোঝে না, কিংবা জানেও না কী করে ঈশ্বরের উজির-নাজিরদের সম্ভাষণ করতে হয়। তারপর তিনি খেয়াল করে দেখলেন যে খুব কাছে থেকে নজর করলে, তাকে বড্ড বেশি মানুষ মানুষ দেখায়। তার গা থেকে বেরোচ্ছে খোলামেলার এক অসহ্য গন্ধ, তার ডানাগুলোর পেছনদিকে গজিয়েছে নানারকম পরভৃৎ আর তার প্রধান পালকগুলোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে পার্থিব সব হাওয়া; দেবদূতদের সগর্ব মর্যাদার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমনকিছুই তার নেই। তারপর তিনি মুরগির খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ছোট্ট একটি কথামৃত আউড়ে কৌতূহলীদের হুঁশিয়ার করে দিলেন ছলাকলাহীন সাদাসিধে অকপট লোক হবার ঝুঁকি কতটা; তিনি ওদের মনে করিয়ে দিলেন যে রোম্যান ক্যাথলিকদের হুল্লোড়ে উৎসবে এসে কৌশলে আচমকা ল্যাং মেরে দেবার একটা বিষম বদঅভ্যাস আছে শয়তানের—যাতে অসাবধানীদের সে বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে, বিপথে নিয়ে যেতে পারে। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে-কোনো ডানা যদি কোনো বাজপাখি আর উড়োজাহাজের তফাত নির্ধারণ করে নেবার কোনো আবশ্যিক উপাদান না হয়, তবে দেবদূতদের শনাক্ত করবার বেলায় ডানার গুরুত্ব তো আরোই কম। তৎসত্ত্বেও তিনি কথা দিলেন যে তিনি তাঁর বিশপকে একটি চিঠি দেবেন যাতে বিশপ তাঁর গির্জাশাসিত পল্লির আর্চবিশপকে লিখতে পারেন, আর তিনি তারপর লিখতে পারেন সর্বোচ্চ মোহান্তকে—যাতে উচ্চতম আদালত থেকে সর্বাধিনায়কের চূড়ান্ত রায়টি পাওয়া যায়।

তাঁর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা—সকলই গিয়ে পড়ল বন্ধ্যা সব হৃদয়ে। বন্দি দেবদূতের খবর এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল যে কয়েকঘণ্টা বাদেই এক বড়ো হাটবাজারের ব্যস্ততা আর শোরগোল উঠল উঠোনে, আর ভিড়কে সরিয়ে দেবার জন্যে ডাকতে হলো সঙ্গিনসমেত সেনাবাহিনীকে, নইলে বাড়িটা তারা প্রায় ধসিয়েই দিত। এই হাটবাজারের এত জঞ্জাল ঝাঁট দিয়ে দিয়ে এলিসেন্দার শিরদাঁড়া যেন দুমড়ে গিয়েছে; শেষটায় তার মাথায় খেলে গেল, আরে, উঠোনের চারপাশে বেড়া দিয়ে সকলের কাছ থেকেই তো দর্শনি বাবদ পাঁচ সেন্ট করে চাওয়া যায়।

কৌতূহলীরা এল দূর-দূরান্তর থেকে। এক ভ্রাম্যমান সার্কাস দলও এসে পৌঁছাল, যার ছিল এক উড়ন্ত দড়বাজিকর, সে ভিড়ের ওপর বার কয় ভোঁ-ভোঁও করলে, কিন্তু কেউ তার দিকে কোনো পাত্তাই দিলে না—কারণ তার ডানাগুলো মোটেই কোনো দেবদূতের মতো ছিল না—বরং সেগুলোকে দেখাচ্ছিল কোনো নাক্ষত্র বাদুড়ের মতো। জগতের সবচেয়ে দুর্ভাগা ও অশক্তরা এল স্বাস্থ্যের সন্ধানে; এল এক বেচারি মেয়ে, জন্ম থেকেই যে গুনে যাচ্ছিল তার বুকের ধুকধুক, গুনতে গুনতে এখন সে সব সংখ্যাই শেষ করে ফেলেছে; এল এক পোর্তুগিজ—কিছুতেই যে কখনও ঘুমোতে পারে না, কারণ তারাদের কোলাহল তার ঘুম কেবলই চটিয়ে দেয়; এল এক ঘুমে হাঁটা লোক, যে দিনে জেগে থাকা অবস্থায় যা-যা করেছে সব রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে উঠে গুবলেট করে দেয়; এছাড়াও কত কত জন, তাদের অবশ্য অত ভয়াবহ সব অসুখ নেই। পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল যে জাহাজডুবির বিশৃঙ্খলা, তার মধ্যে পেলাইও আর এলিসেন্দা অবশ্য তাদের ক্লান্তিতেই সুখী, কারণ হপ্তা শেষ হবার আগেই তারা তাদের সবগুলো ঘর

ঠেসেছে টাকাকড়িতে, আর ভেতরে ঢোকবার পালা কখন আসে তার জন্যে যে তীর্থযাত্রীর সার অপেক্ষা করছে বাইরে, তা এমনকি দিগন্তও পেরিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

এই দেবদূতই ছিল একমাত্র যে তার নিজের এই হুলস্থূল নাট্যে কোনোই ভূমিকা নেয়নি। তার এই ধার-করা নীড়ে কীভাবে সে একটু আরাম পাবে, তারই চেষ্টায় সে কাটায় সারা সময়—তেলের বাতি বা উপাসনার মোমবাতিগুলোর নারকীয় জ্বালায় আর উত্তাপে তার প্রায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়, অথচ ওগুলো সারাক্ষণ ওই তারের খাঁচায় জ্বলছে। গোড়ায় তাকে ওরা ন্যাপথালিন খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল, সেই পরমজ্ঞানী পড়োশিনির প্রজ্ঞা অনুযায়ী তাই নাকি দেবদূতের খাদ্য হিসেবে বিধানবিদিত। কিন্তু সে ওসব ফিরিয়ে দিয়েছে, যেমন সে ফিরিয়ে দিয়েছে পোপের ভোজ, পাপীতাপীরা প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে মানত করে এসব ভূরিভোজ তার কাছে নিয়ে এসেছিল; আর তারা কখনও এটা বুঝে উঠতে পারেনি সে যে বেগুনভর্তা ছাড়া আর কিছুই খায় না, সে কি সে একজন দেবদূত বলে না কি ফোগলা দাঁতের এক বুড়ো থুরথুরে বলে। তবে একমাত্র অতিপ্রাকৃত শক্তি মনে হল তার ধৈর্য। বিশেষত প্রথম দিনগুলোয়, তার ডানায় যেসব নাক্ষত্র পরভৃৎ জম্পেশ করে গজিয়েছে তার খোঁজে যখন মুরগিরা তাকে ঠোকরাত, আর পঙ্গুরা ছিড়ে নিত তার পালক তাদের বিকল ঠুটো অঙ্গগুলোয় ছোঁয়াবার জন্যে, আর এমনকি যাদের প্রাণে সবচেয়ে দয়াধর্ম ছিল তারাও যখন তাকে তাগ করে ঢিল ছুড়ত যাতে সে উঠে পড়ে আর দাঁড়ালে তাকে কেমন দেখায় সেটা দেখবার জন্যে—তখনও সে শান্তই থাকত। একমাত্র যেবার তারা তাকে উসকে তাতিয়ে দিতে পেরেছিল সে তখনই যখন তারা তার পাশটা পুড়িয়ে ছিল তপ্ত লোহায়, যা দিয়ে ছ্যাঁকা লাগিয়ে তারা বলদের গায়ে মার্কা দিত—কারণ সে এতক্ষণ কেমন ঝিম মেরে নিশ্চল পড়েছিল যে তারা ভেবেছিল সে বুঝি মরেই গিয়েছে। আঁতকে জেগে উঠেছিল সে তখন, তার ওই রুদ্ধ দুর্বোধ্য অচেনা ভাষায় চেঁচিয়ে প্রলাপ বকেছিল, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল তার, আর সে তার ডানা ঝাপটে ছিল বার দুই, যা মুরগির বিষ্ঠা আর চান্দ্র ধুলোর এক ঘূর্ণিহাওয়া তুলে দিয়েছিল, আর এমন একটা দমকা ঝাপটা তুলেছিল আতঙ্কের যাকে কিছুতেই এই জগতের বলে মনে হয়নি। যদিও অনেকে ভেবেছিল তার সাড়াটা ঠিক ক্রোধের নয়, বরং জ্বালার, ব্যথার। আর সেই থেকে তারা হুঁশিয়ার হয়ে যায় যাতে তাকে আর এমন চটিয়ে দেওয়া না হয়, কারণ বেশিরভাগ লোকই বুঝেছিল তার এই নিষ্ক্রিয় ঔদাস্য মোটেই কোনো বীরনায়কের বিশ্রাম নয়, বরং কোনো মহাপ্লাবনের পূর্বমুহূর্তের থমথমে ছমছমে ঘুম।

বাড়ির ঝি-চাকরানিদের প্রেরণা পাওয়া সব সূত্র দিয়েই পাদ্রে গোনসাগা ভিড়ের ছ্যাবলামিটা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। বন্দির প্রকৃতি সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় কী আসে তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কিন্তু রোম থেকে আসা চিঠিতে কোনো তাড়াই দেখা গেল না। তারা তাদের সময় কাটিয়ে দিলে এই সব প্রশ্নে—বন্দির কোনো নাভি আছে কি না, তার কথাবার্তার সঙ্গে সিরিয়াস প্রাচীন ভাষার কোনো সম্পর্ক আছে কি না, একটা ছুঁচের ডগায় তার মতো কটা মাথা এটে যায়, অথবা সে কি নিছকই নরওয়ের কোনো লোক, গায়ে ডানা লাগিয়ে নিয়েছে। ওই সব তুচ্ছ অতি সংক্ষিপ্ত চিঠিগুলো হয়তো সময়ের শেষ অব্দিই যাতায়াত করতে থাকত, যদি না এক দৈব ঘটনা পাদ্রে গোনসাগার সব নাজেহাল বিপত্তির একটা ইতি টেনে দিত।

ঘটেছিল কী, ওই দিনগুলোয়, আরো সব কত কত উৎসব মেলা আর সার্কাসের হরেকরকম বা আকর্ষণের মধ্যে, শহরে এসে পৌঁছেছিল একটি মেয়ের ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী, যে তার বাবা-মার কথার অবাধ্য হয়েছিল বলে মাকড়শা হয়ে গিয়েছে। দেবদূতকে দেখতে যত পয়সা দিতে হয়, একে দেখতে যেতে তার চেয়ে যে কম পয়সা দর্শনি বাবদ দিতে হয়, শুধু তাই নয়, তার এই অসম্ভব দশার জন্যে লোককে যা খুশি প্রশ্ন করবারও সুযোগ দেওয়া হয়, এমনকি তাকে আগাপাশতলা খুঁটিয়েও দেখতে দেওয়া হয় যাতে তার এই বিভীষিকার সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে কারো মনেই কোনো সন্দেহ না থাকে। সে এক ভয়ংকর তারানতুলা, একটা মস্ত ভেড়ার মতো বড়ো, আর তার মাথাটা এক বিষাদময়ী কুমারী মেয়ের। যা ছিল সবচেয়ে হৃদয় বিদারক, তা কিন্তু তার এই তাজ্জব আকৃতি নয়, বরং তার অকৃত্রিম দুঃখী করুণ গলা, যে গলায় সে তার দুর্ভাগ্যের সব খুঁটিনাটি বর্ণনা করত। যখন সে একেবারেই ছেলেমানুষ, এক নাচের আসরে যাবে বলে কাউকে কিছু না জানিয়ে সে তার বাবা-মার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, আর অনুমতি না নিয়ে সারা রাত ধরে নাচবার পর সে যখন এক বনের মধ্যে দিয়ে ফিরছিল তখন হঠাৎ এক ভয়ংকর বজ্রপাত আকাশকে দু-ভাগে ফেড়ে দিয়েছিল আর ফাটলের মধ্য দিয়ে নেমে এসেছিল জ্বলন্ত গন্ধকের এক বিদ্যুৎশিখা যা তাকে বদলে দিয়েছিল এই আজব মাকড়শায়। যাদের প্রাণে দয়াদাক্ষিণ্য আছে তারা তার মুখে মাংসের বড়া ছুড়ে দেয়—একমাত্র তাই তাকে অ্যাদ্দিন ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। এরকম এক দৃশ্য, যার মধ্যে এতই মানবিক সত্য আর এমন এক ভয়ংকর শিক্ষা আছে, যে তা চেষ্টা না করেও হারিয়ে দিতে পারে কোনো উদ্ধত দেবদূতের প্রদর্শনী, যে দেবদূত কিনা ক্বচিৎ কখনও নাক সিটকে তাকায় মর্ত্যবাসীদের দিকে। তাছাড়া, দেবদূতের নামে যে কটা অলৌকিক অঘটনের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা শুধু এক ধরনের মানসিক বিশৃঙ্খলাই বোঝাচ্ছিল। যেমন— এক অন্ধ আতুর, সে তার দৃষ্টি ফিরে পায়নি বটে, তবে তার তিনটে নতুন দাঁত গজিয়ে গিয়েছিল; কিংবা এক পঙ্গু বেচারি যে হেঁটে হেঁটে গিরিলঙ্ঘন করতে পারেনি বটে তবে একটা লটারি প্রায় জিতেই যাচ্ছিল; কিংবা এক কুষ্ঠরোগী যার ঘা-গুলো থেকে গজিয়েছিল সূর্যমুখী ফুল। কোনো সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো এসব অলৌকিক কাণ্ড আসলে প্রায় বিসদৃশ সব মশকরা বা কৌতুকের মতোই—আর এ সবের ফলেই দেবদূতের মানসম্ভ্রম খ্যাতি ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল—তারপর মাকড়শায় বদলে যাওয়া মেয়েটি আসতেই তার সব নামডাক একেবারেই ধসে পড়ল। এইভাবেই পাদ্রে গোনসাগা তাঁর অনিদ্রা রোগ থেকে চিরকালের মতো রেহাই পেয়ে গেলেন আর পেলাইওদের উঠোন সেইরকমই ফাঁকা হয়ে গেল তিনদিন তিনরাত্তির যখন একটানা ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়েছিল আর কাঁকড়ারা হাঁটছিল তাদের শোবার ঘরে।

বাড়ির মালিকদের অবশ্য বিলাপ করার কোনোই কারণ ছিল না। যে টাকা তারা কামিয়েছিল তা দিয়ে তারা এক চকমেলানো দোতলা বাড়ি বানিয়ে নিলে, সে বাড়ির ছিল অলিন্দ আর বাগান আর উঁচু তারের জাল, শীতের সময় যাতে কাঁকড়ারা আর ভেতরে ঢুকতে না পারে, আর জানালায় ছিল লোহার গরাদ যাতে কোনো পথহারা দেবদূতও ঢুকে পড়তে না পারে আচমকা। শহরের কাছেই পেলাইও একটা খরগোশ পালন করবার ঘিঞ্জি গোলকধাঁধা বানিয়ে নিলে, চিরকালের মতো ইস্তফা দিলে তারা সাধ্যপালের কাজে, আর এলিসেন্দা কিনে নিলে কতগুলো উঁচু ক্ষুরওয়ালা ঢাকা জুতো আর রামধনু-রঙা রেশমি

কাপড়ের অনেক প্রস্থ পোশাক, তখনকার দিনে রোববারে রোববারে যেসব পোশাক পরত সবচেয়ে অভিজাত ও কাঙ্ক্ষিত মহিলারা। যা যা তাদের কোনো মনোযোগ পায়নি, তার মধ্যে মুরগির খাঁচাটাই একমাত্র জিনিস ছিল না। যদি তারা রাসায়নিক দিয়ে তা ধুয়ে দিয়ে থাকে আর তার ভেতরে বারবার মস্তকির অশ্রু পুড়িয়ে থাকে, সে কিন্তু মোটেই এই দেবদূতের অর্চনায় নয়, বরং সেই গু-গোবরের স্তূপের দুর্গন্ধ তাড়িয়ে দিতেই—ভূতের মতো এখনও যা ঝুলে আছে সবখানে, আর নতুন দালানটাকে বানিয়ে দিচ্ছে পোড়োবাড়ি। গোড়ায়, যখন তাদের বাচ্চা হাঁটতে শিখল, তারা খুবই সাবধানে ছিল সে যাতে কখনও মুরগির খাঁচাটার খুব কাছে না যায়। কিন্তু তারপর তারা ক্রমে ক্রমে তাদের ভয় হারাতে শুরু করল, আর গন্ধটায় অভ্যস্ত হয়ে গেল। বাচ্চার দ্বিতীয় দাঁতটি বেরোবার আগেই সে মুরগির খাঁচার ভেতরে খেলতে চলে যেত, খাঁচার তারগুলো ততদিনে অবহেলায় অযত্নে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। অন্য কোনো মর্ত্যবাসীর সঙ্গে কোনো মাখামাখিই করেনি দেবদূত, বরং দূরে দূরেই থাকত, এখনও সে তেমন একটা মাখামাখি করে না; তবে সব ভুল ধারণা হারিয়ে বসবার পর কোনো কুকুর যেমন বাচ্চাদের যাবতীয় যাচ্ছেতাই অপমান ও নিগ্রহ পরম ধৈর্যভরে সহ্য করে, তেমনি ধৈর্যের সঙ্গে দেবদূত এই বাচ্চাটিকে সহ্য করত। একই সঙ্গে দু'জনকেই পেড়ে ফেলল জলবসন্ত। যে ডাক্তার বাচ্চাটির রোগ দেখতে এসেছিল সে অবশ্য দেবদূতের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শোনবার লোভ সামলাতে পারলে না, আর সে তার বুকে এত শিস শুনতে পেলে আর এতই শোরগোল শুনতে পেলে তার বুক্কে যে তার পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব বলে ডাক্তারের মনে হল না। যেটা তাকে সবচেয়ে তাক লাগিয়ে দিলে সেটা এই ডানা দুটোর যুক্তি ও প্রকৃতি। এ দুটি এমনই স্বাভাবিক যে পুরোপুরি কোনো মানুষেরই আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে হয়, আর তার অবাক লাগল এই ভেবে যে অন্য মানুষদেরই বা কোনো ডানা নেই কেন।

বাচ্চা যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করল, সেটা রোদে বৃষ্টিতে মুরগির খাঁচার সম্পূর্ণ ধ্বংসের কিছুকাল পরে। দেবদূত এখন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, পথহারা দিকভোলা কোনো মুমূর্ষের মতো। ওরা তাকে ঝাঁটা মেরে বার করে দেয় শোবার ঘর থেকে, কিন্তু পরক্ষণেই তাকে দ্যাখে রান্নাঘরে, একই সঙ্গে তাকে এত বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় বলে মনে হয় যে তারা অবাক হয়ে ভাবে এর আবার আরো কতগুলো সংস্করণ হয়ে গেল নাকি—সে কি নিজেকেই তৈরি করছে বাড়ির সকল কোণায়খামচিতে? আর বিপর্যস্ত ও তিতিবিরক্ত এলিসেন্দা ডুকরে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলতে লাগল দেবদূতে দেবদূতে থই থই করা কোনো নরকে বাস করা কী যে জঘন্য কাণ্ড ! দেবদূত এখন খেতেই পারে না কিছু, তার প্রত্নপ্রাচীন চোখও এখন এত ঘোলাটে হয়ে গেছে যে সবসময়ে সে জিনিসপত্তরে ধাক্কা খায়। তার শেষ পালকগুলোর নিছক সূক্ষ্ম জালের মতো দাঁড়গুলোই এখন আছে তার। পেলাইও একটা কম্বল ছুড়ে দেয় তার ওপর, তাকে করুণা করে একটা আটচালার নীচে শুতে দেয়। আর শুধু তখনই তারা আবিষ্কার করলে যে রোজ রাত্তিরে তার জ্বর আসে, আর কোনো বুড়ো নরওয়েবাসীর জিভজড়ানো ভাষায় সে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকে। যে কয়েকবার তারা বিষম ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এ তারই একটা, কারণ তারা ধরেই নিয়েছিল যে এ বুঝি মরতে বসেছে, আর তাদের জ্ঞানীগুণী পড়োশিনি অব্দি তাদের বলতে পারলে না কোনো মরা দেবদূতকে নিয়ে তারা কী করবে।

অথচ তবু যে সে তার সবচেয়ে জঘন্য শীতকালটাই টিকে গেল তাই নয়, প্রথম রোদ্দুরে ভরা দিনগুলো আসতেই মনে হল সে ক্রমেই সেরে উঠছে। উঠোনের সবচেয়ে দূর কোণায় সে কয়েকদিন

নিশ্চল পড়ে থাকে, যেখানে কেউই তাকে দেখতে পায় না; আর ডিসেম্বরের গোড়ায় তার ডানায় মস্ত কতগুলো আড় ধরা পালক গজিয়ে ওঠে, কোনো কাকতাড়ুয়ার পালক যেন সেগুলো, তার জরার আরেকটা দুর্ভাগা লক্ষণ বলেই মনে হল এই পালকগুলোকে। কিন্তু সে নিজে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল এসব বদলের আসল কারণ, কেন-না কেউ যাতে তা না দেখতে পায় এবিষয়ে সে খুবই সজাগ ছিল, সে খুবই সাবধান ছিল কেউ যাতে শুনতে না পায় আকাশভরা ঝিকিমিকি তারার তলায় সে যখন সিন্ধুরোলের গান গুনগুন করে। একদিন সকালে এলিসেন্দা যখন পেঁয়াজকলির গুচ্ছ কাটছে, তখন আচমকা মনে হল হঠাৎ যেন দূর বারদরিয়ার এক ঝলক হাওয়া এসে ঢুকেছে রান্নাঘরে। তখন সে জানালায় গিয়ে দেখতে পেলে দেবদূত এই প্রথম তার ডানা ছড়িয়ে ওড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমনই অগোছালো ও অনভ্যস্ত তার এ অপচেষ্টা যে তার নখগুলো সবজিবাগানের মধ্যে গভীর সব খাঁজ কেটে দিচ্ছে। আর সে হয়তো তার জবুথবু উলটোপালটা ডানা ঝাপটানিতে আটচালাটাও ধসিয়ে দিত, বিশেষত বারে বারে সে যেরকম হড়কে যাচ্ছিল, কিছুতেই আঁটো করে চেপে ধরতে পারছিল না হাওয়া। তবু অবশ্য কেমন নড়বড়েভাবে সে একটু উঠতে পারল ওপরে। এলিসেন্দা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে—নিজের জন্যে স্বস্তি আর দেবদূতের জন্যেও স্বস্তি—যখন সে দেখতে পেলে যে দেবদূত এখন শেষ বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, কোনোরকমে সে নিজেকে ধরে রেখেছে উড়ালটায়, কোনো মতিচ্ছন্ন জরাগ্রস্ত শকুনের ঝুঁকিতে ভরা ডানাঝাপটানি দিয়ে। পেঁয়াজ কাটা সারা হয়ে যাবার পরও এলিসেন্দা তাকে দেখতেই থাকে তাকিয়ে। দেখতেই থাকে যখন তাকে আর দেখাই সম্ভব ছিল না—কারণ সে তো আর তখন তার জীবনের কোনো উৎপাত বা জ্বালাতন নয়, বরং সমুদ্রের দিকচক্রবালে নিছকই কাল্পনিক একটা ফুটকিই যেন।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ (১৯২৭-২০১৪) : জন্ম দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ার আরকাটাকায়। দীর্ঘদিন সাংবাদিক হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকার ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কাটান। মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। গদ্য সাহিত্যে 'জাদু বাস্তবতা' ধারার তিনিই প্রধান প্রবক্তা। একশো বছরের নিঃসঙ্গতা, কলেরার দিনগুলিতে প্রেম, কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না, চিলিতে গোপনে, বিপন্ন এক নাবিকের গল্প, এই শহরে কোন চোর নেই প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত রচনা। ১৯৮২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর জাদু বাস্তবতা ধারার পাঠ্য এই ছোটোগল্পটি 'এই শহরে কোন চোর নেই' থেকে নেওয়া হয়েছে।

চারণকবি

ভারভারা রাও

নিয়মকানুন যখন সব লোপাট
আর সময়ের ঢেউ-তোলা কালো মেঘের দল
ফাঁস লাগাচ্ছে গলায়
চুঁইয়ে পড়ছে না কোনো রক্ত
কোনো চোখের জলও নয়
ঘূর্ণিপাকে বিদ্যুৎ হয়ে উঠছে বাজ
ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হয়ে উঠছে প্রলয়ঝড়, আর,
মায়ের বেদনাশ্রু বুকে নিয়ে
জেলের গরাদ থেকে বেরিয়ে আসছে
কবির কোনো লিপিকার স্বর।
যখন কাঁপন লাগে জিভে
বাতাসকে মুক্ত করে দেয় সুর
গান যখন হয়ে ওঠে যুদ্ধেরই শস্ত্র
কবিকে তখন ভয় পায় ওরা।
কয়েদ করে তাকে, আর
গর্দানে আরো শক্ত করে জড়িয়ে দেয় ফাঁস
কিন্তু, তারই মধ্যে, কবি তাঁর সুর নিয়ে

শ্বাস ফেলছেন জনতার মাঝখানে

ফাঁসির মঞ্চ

ভারসাম্য রাখবার জন্য

মিলিয়ে যাচ্ছে মাটিতে

স্পর্ধা জানাচ্ছে মৃত্যুকে

আর তুচ্ছ ফাঁসুড়েকে

দিচ্ছে ঝুলিয়ে

অনুবাদ ঃ শঙ্খ ঘোষ

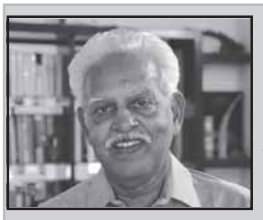

পেদ্যালা ভারভারা রাও 1940 সালের 3রা নভেম্বর চিন্না পেন্ডিয়ালা, ওয়ারাঙ্গাল জেলার একটি তেলেগু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 1960 সালে ''ওসমানিয়া'' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তেলেগু সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রথম জীবনে তিনি তেলেঙ্গানার দুটি বেসরকারি কলেজে তেলেগু সাহিত্য পড়াতেন। সেখান থেকে তিনি ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে প্রকাশনা সহকারী হিসাবে কাজ করার জন্য নয়াদিল্লীতে চলে যান। পরে সেই চাকরি ছেড়ে CKM কলেজ ওয়ারাঙ্গালে তেলেগু প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন ও পরবর্তীতে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হন। 1998 সালে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

1966 সালে সাহিথিমিথরুলু (সাহিত্যের বন্ধু) নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। রাও এর প্রথম কবিতা সংকলন—চালি নেগাল্লু (ক্যাম্পফায়ার) 1968 সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর বিভিন্ন কবিতা সংকলনগুলির মধ্যে কয়েকটি হলো—জীবনাহি (পালস, 1970), ওরেগিম্পু (মিছিল, 1973), স্বেচ্ছা (স্বাধীনতা, 1978)। 2008 সালে ভার ভারারাও কবিতাম (1957-2007) (ভারভারা রাওয়ের কবিতা) শিরোনামে নির্বাচিত কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর কবিতা প্রায় সব ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

সেমিস্টার-II

ছুটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট্ করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল; নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যক-কালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, ''দেখ্, মার খাবি। এইবেলা ওঠ্।''

সে তাহাতে আরো একটু নড়িয়াচড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল - সাহস হইল না। কিন্তু, এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে, কিন্তু করিল না; কারণ, পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর-কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল— 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।' গুঁড়ি এক পাক ঘুরিতে-না-ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য, গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফল লাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়।''

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, ''ঐ হোথা।'' কিন্তু কোন দিকে যে নির্দেশ করিল, কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কোথা।''

সে বলিল, ''জানি নে।'' বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগ্‌দি আসিয়া কহিল, ''ফটিকদাদা, মা ডাকছে।''

ফটিক কহিল, ''যাব না।''

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল; ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, ''আবার তুই মাখনকে মেরেছিস!''

ফটিক কহিল, ''না, মারি নি।''

''ফের মিথ্যে কথা বলছিস!''

''কখ্খনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।''

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, ''হাঁ, মেরেছে।''

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, ''ফের মিথ্যে কথা!''

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন, ''অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!''

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ''কী হচ্ছে তোমাদের।''

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, ''ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে।'' বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়শুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, ''ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।''

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন।

বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?''

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, ''যাব।''

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল-কোন্ দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায়, কি কী একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

'কবে যাবে' 'কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য-বশত তাহার ছিপ, ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিতি পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কীরূপ একটা বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি কাণ্ডজ্ঞান আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ে কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না; কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সব চেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত-অবশেষে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, ''ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও গে। একটু পড়ো গে যাও।'' - তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেইসব দল-বল উপদ্রব স্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা-কেবল একটু কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলিসময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন-সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারকান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দুটি একটি ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ''মামা, মার কাছে কবে যাব।'' মামা বলিয়াছিলেন, ''স্কুলের ছুটি হোক।''

কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, ''বই হারিয়ে ফেলেছি।''

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, ''বেশ করেছ! আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।''

ফটিক আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল-সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্ সির্ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল, তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল, ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কীরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিশে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় এক-হাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিশের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, ''কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।''

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্‌খিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, ''আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।''

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, ''মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি।''

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল; বলিল, ''মা, আমাকে মারিস নে মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি।''

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, ''ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।''

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতি মুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, ''এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে-এ -এ না।'' কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, ''ফটিক! সোনা! মানিক আমার!''

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, ''অ্যাঁ''।

মা আবার ডাকিলেন, ''ওরে ফটিক, বাপধন রে!''

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, ''মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও গীতিকার। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান রূপকারদের একজন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা জন্ম দিয়েছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের, যা পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পায়। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। অন্ধ গোঁড়ামির বিরোধিতা ও নতুন ভাবনাকে স্বাগত জানানো তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতী, হিতবাদী, সাধনা প্রভৃতি পত্রিকার জন্য ছোটোগল্প লিখতে শুরু করেন। শিলাইদহে (বর্তমানে বাংলাদেশে) জমিদারি পরিদর্শনকালে তিনি খুব কাছ থেকে গ্রামীণ বাংলা ও সাধারণ মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। গ্রামবাংলার সাধারণ জীবনের সেই অপরূপতা ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন ছোটোগল্পে। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে রয়েছে দেনাপাওনা, কাবুলিওয়ালা, গুপ্তধন, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, ক্ষুধিত পাষাণ, ছুটি, ল্যাবরেটরী, সুভা, নষ্টনীড়, অতিথি, খাতা, হৈমন্তী, বলাই, পোস্টমাস্টার, মধ্যবর্তিনী প্রভৃতি। তাঁর রচিত ছোটো গল্পগুলি 'গল্পগুচ্ছ' সংকলনগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শনি ও মঙ্গলের, মঙ্গলই হবে বোধ হয়, যোগাযোগ হলে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু-দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়, আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে, কোনো এক আশ্চর্য সরোবরে পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে-মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা। সামনে নীচু একটা জলার মতো জায়গার উপর দিয়ে ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চলে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন, সূর্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘন জঙ্গলে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোনো দিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখিরাও যেন সভয়ে সে জায়গা পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। একটা স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নীচের জলা থেকে একটু ক্রুর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড়ো রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদাজলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে নালার মতো রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দু-ধারে বাঁশঝাড় আর বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরো দু'জন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়তো আপনার মতো ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়, তবু এ অভিযানে তারা এসেছে, কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে।

তিনজনে মিলে তারপর সামনে নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন। মাঝে মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাবে না। মশাদের ঐকতান আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। আবার বড়ো রাস্তায় উঠে ফিরতি কোনো বাসের চেষ্টা করবেন কিনা যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদাজলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে বোবা জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গোরুর গাড়ি জঙ্গলের ভিতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গোরুগুলি। মনে হবে পাতালের কোনো বামনের দেশ থেকে গোরুর গাড়ির এই ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না করে সেই গোরুর গাড়ির ছইয়ের ভিতর তিনজনে কোনোরকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্বাধিক বস্তু কীভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গোরুর গাড়িটি তারপর যে-পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে শুরু করবে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সংকীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মতো পথ সামনে একটু একটু করে উন্মোচন করে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য, কিন্তু তবু গোরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে পায়ে পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথাও ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধরে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ এক সময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঞ্ঝনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছইয়ের ভিতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকারভাবে আপনাকে জানাবে, আজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।

ব্যাপারটা ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানেস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কিনা, কম্পিত কণ্ঠে এ প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র, এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত না হলে এই ক্যানেস্তারা-নিনাদই তাকে তফাত রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্রসংকুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কী করে সম্ভব, আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গোরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হয়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী গাড়ির দু-পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সেসব ধ্বংসাবশেষ— কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে বসে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোনো কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন বলে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব কিছু নিমগ্ন হয়ে আছে; জাদুঘরের নানা প্রাণীদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু-তিনবার মোড় ঘুরে গোরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত-পাগুলো নানাস্থান থেকে কোনোরকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্টভাবে আপনারা একে একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধরেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা-পচা গন্ধ। অর্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা ভাঙা ছাদ, ধসে-পড়া দেয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে নবোদিত চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক এক কলশি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহু যুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়তো কেউ আগে কখনও পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গিয়েছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মতো থেকে থেকে আপনাদের উপর বর্ষিত হবে। দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপনার দুটি বন্ধুর একজন পানরসিক ও অপরজনের নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝের উপর কোনোরকমে শতরঞ্চির আবরণ পড়তে-না-পড়তে একজন তার উপর নিজেকে বিস্তৃত করে নাসিকাধ্বনি করতে করবেন, অপরজন পানপাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত করে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাচের চিমনি ক্রমশ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাবে। কোনো রহস্যময় বেতার-সংকেতে খবর পেয়ে সে অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হলে দেয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কুলীন, ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে উপরের ছাদে উঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতি মুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খসে পড়ে ভূপতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোনো দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপনি উপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে অলিসা ভেঙে ধুলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভিতর থেকে এ অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে এই মৃত্যু সুসুপ্তি মগ্ন মায়াপুরীর কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি

রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সংকীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ বলে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনার চোখে পড়বে। সেই আলোর রেখা আড়াল করে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথরাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই, আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিকবাদে মনে হবে, সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে ছায়া সরে গিয়েছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গিয়েছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদবুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গিয়েছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নীচে নেমে আসবেন এবং কখন এক সময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না।

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হয়ে দেখবেন, এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখির কলরবে চারিদিক ভরে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। এক সময়ে ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য-আরাধনার জন্যে শ্যাওলা ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে বসে গুঁড়ি-পানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমেত বঁড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকে-পড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখি ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শিকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় আপনাকে বিদ্রুপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত করে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোনো ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাতলা কাচের মতো পাখা নেড়ে আপনার ফাতনাটার উপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে থেকে উদাস, ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হয়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাতনা মৃদুমন্দভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন, একটি মেয়ে পিতলের ঝকঝকে কলশিতে পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাতনা লক্ষ করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে কলশিটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।

কলশি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, 'বসে আছেন কেন? টান দিন।'

সে কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে, এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুন বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে যাওয়া ফাতনা আবার ভেসে উঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বঁড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুতভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে এবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর

পদে ঘাট ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গিয়েছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ করে অনেক আগেই উড়ে গিয়েছে। মাছেরা আপনার শক্তি -সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব বলে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

এক সময়ে হতাশ হয়ে আপনাকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবেন, আপনার মৎস্যশিকার নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন করে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হয়ে এ কাহিনি কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা করে হয়তো আপনার পানরসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন, 'কে আবার বলবে! এই মাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!'

আপনাকে কৌতূহলী হয়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়তো জানতে পারবেন যে পুকুর ঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না মেয়েটি আপনার পানরসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেইসঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মতো তাদের ওখানেই হয়েছে।

যে ভগ্নস্তূপে গত রাত্রে ক্ষণিকের জন্যে একটি ছায়ামূর্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ সরে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেননি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়তো আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎসামান্য, হয়তো যামিনী নিজেই পরিবেশন করছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই, আপনি আগেই লক্ষ করেছেন, শুধু কাছ থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য আরো বেশি করে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন-বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন। একদিন যেন সে এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু-চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। উপরতলার কোনো ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হয়ে উঠছে মনে হবে, সেইসঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ করে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্তত করে যে যেন শেষে মরিয়া হয়ে দরজা থেকে ডাকবে, 'একটু এখানে শুনে যাও মণিদা।'

মণিদা আপনার সেই পানরসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতর স্বরে বিপন্নভাবে বলছে, 'মা তো কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কী যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কী বলব!'

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, 'ওঃ সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, কেবলই বলছেন, ''সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস?'' কী যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত অধৈর্যতা বেড়েছে যে, কোনো কথা বোঝালে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে, তখন ওঁর প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে ওঠে!'

'হুঁ, এ তো বড়ো মুশকিল দেখছি। চোখ থাকলেও না হয় দেখিয়ে দিতাম যে, যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।'

উপর থেকে দুর্বল অথচ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতর কণ্ঠে অনুনয় করবে, 'তুমি একবারটি চলো মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ঠান্ডা করতে পারো।'

'আচ্ছা, তুই যা, আমি আসছি।' মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে, 'এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ির হাত-পা পড়ে গেছে, চোখ নেই, তবু বুড়ি পণ করে বসে আছে কিছুতেই মরবে না।'

ব্যাপারটা কী এবার আপনারা হয়তো জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, 'ব্যাপার আর কী! নিরঞ্জন বলে ওঁর দূর-সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে ছোকরা এসে ওঁকে বলে গিয়েছিল বিদেশের চাকরি থেকে ফিরে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর-পুরীর ভেতর বসে সেই আশায় দিন গুনছে।'

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না, 'নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরেনি?'

'আরে, সে বিদেশে গিয়েছিল কবে যে ফিরবে! নেহাত বুড়ি নাছোড়বান্দা বলে তাকে এই ধাপ্পা দিয়ে গিয়েছিল। এমন ঘুঁটে-কুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে-থা করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে কথা ওঁকে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হলে এখুনি তো দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?' স্তব্ধ

'যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?'

'তা আর জানে না! কিন্তু মার কাছে বলবার উপায় তো নেই। যাই, কর্মভোগ সেরে আসি।' বলে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়তো বলে ফেলবেন, 'চলো আমিও যাব।'

'তুমি যাবে'! মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

'হ্যাঁ। কোনো আপত্তি আছে গেলে?'

'না আপত্তি কীসের!' বলে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সংকীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে ঘরটিতে আপনি পৌঁছোবেন, মনে হবে উপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটি মাত্র জানালা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তাপোশে ছিন্ন-কন্থা-জড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোশের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে, 'কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল বাবা? তুই আসবি বলে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্তি হয়ে মরতে পারছিলাম না। এবার তো আর অমন করে পালাবি না?'

মণি কী যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, 'না মাসিমা, আর পালাব না।'

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থানুর মতো মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনোদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভিতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন করে পরীক্ষা করছে। কটি স্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে ধীরে সময়ের সাগরে শিশির বিন্দুর মতো ঝরে পড়ছে, আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, 'আমি জানতাম, তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই তো এমন করে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুনছি।'

বৃদ্ধা কথা বলে হাঁফাবেন, চকিতে একবার যামিনীর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোশের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কী ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে, ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরি এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হয়ে যেতে আর বুঝি দেরি নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, 'যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে বলে বলছি না, এমন হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হয়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট করে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই, তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ, দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মতো ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইট আঁকড়ে এখানে-সেখানে ধুঁকছে, এর মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হয়ে ও কী না করছে!'

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোটো একটি নিশ্বাস ফেলে বলবেন, 'যামিনীকে তুই নিবি তো বাবা? তোর শেষ কথা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।'

ধরা গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।'

তারপর বিকালে আবার গোরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে। আপনারা তিনজনে একে একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ তুলে যামিনী শুধু বলবে, 'আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল!'

আপনি হেসে বলবেন, 'থাক-না। এবারে পারিনি বলে তেলেনাপোতার মাছ কি বারবার ফাঁকি দিতে পারবে?'

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভিতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে একশো না দেড়শো বছর আগে প্রথম ম্যালেরিয়ার মড়কের এক দুর্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতিবিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল—আপনার বন্ধুরা হয়তো সেই আলোচনা করবেন। যেসব কথা ভালো করে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সংকীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃৎস্পন্দনে একটি কথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছে শুনবেন, 'ফিরে আসব, ফিরে আসব।'

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছোবেন তখনো আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছোটোখাটো বাধা-বিড়ম্বিত কটি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু করে কুয়াশা জমেছে কিনা আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত করে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন, সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে লেপ-তোশক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের পারা জানাবে এক শত পাঁচ ডিগ্রি, ডাক্তার এসে বলবে, 'ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন?' আপনি শুনতে শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলো-হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া-মোছা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। অস্ত যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথায় কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশার কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার। পিতার রেলের চাকরির সুবাদে ভারতের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সাহিত্যজীবনে সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। তীক্ষ্ণধার ভাষা আর তির্যক ভঙ্গি তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে শ্লেষের তির বা সামাজিক-রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ : *বেনামী বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, মৃত্তিকা, পঞ্চশর, অফুরন্ত, জলপায়রা, ধূলিধূসর, মহানগর, সপ্তপদী, নানা রঙে বোনা*। *শুধু কেরানী, মোট বারো, পুন্নাম, শৃঙ্খল, বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে* প্রভৃতি তাঁর লেখা অবিস্মরণীয় ছোটোগল্প। তাঁর লেখা বিজ্ঞান-নির্ভর রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে *পিঁপড়ে পুরাণ, মঙ্গলবৈরী, পৃথিবীর শত্রু, করাল কীট, ময়দানবের দ্বীপ* প্রভৃতি। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'শুধু কেরাণী'। তিনি 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'বাংলার কথা', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, লিখেছেন সুধীরচন্দ্র সরকারের 'মৌচাক' পত্রিকায়। ঘনাদা, মামাবাবু, ভূত-শিকারি মেজকর্তা এবং গোয়েন্দা-কবি পরাশর বর্মা প্রভৃতি তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি বিখ্যাত চরিত্র।

ভাব সম্মিলন

বিদ্যাপতি

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।।
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল।।
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই।।
শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই-চারি।।

বিদ্যাপতি : পঞ্চদশ শতকের মৈথিলি কবি। বঙ্গদেশে তার প্রচলিত পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি। কথিত আছে যে পরমপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন তার রচিত পদ গাইতে ভালবাসতেন। **বাঙালিরা চর্যাগীতির** ভাষা থেকে এই ব্রজবুলীকে অনেক সহজে বুঝতে পারেন। বিদ্যাপতিকে বাঙালি কবিদের অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয়। কবি বিদ্যাপতির জন্ম দ্বারভাঙা জেলার মধুবনী পরগনার বিসফী গ্রামের এক বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে। তার রচনাবলির মধ্যে রয়েছে কীর্তিলতা, ভূপরিক্রমা, কীর্তিপতাকা, পুরুষ পরীক্ষা, শৈবসর্বস্বসার, গঙ্গাবাক্যাবলি, বিভাগসার, দানবাক্যাবলি, লিখনাবলি, দুর্গাভক্তি- তরঙ্গিনী। তিনি প্রায় আট শ' পদ রচনা করেন। বিদ্যাপতি যে বিপুল সংখ্যক পদে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা রূপায়িত করেছেন, তার মধ্যে রাধার বয়ঃসন্ধি অভিসার, প্রেমবৈচিত্র্য ও আপেক্ষপানুরাগ, বিরহ ও ভাবসম্মিলনের পদগুলি বিশেষ উৎকর্ষপূর্ণ। কবি বিদ্যাপতি 'মৈথিল কোকিল' ও 'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাত। এই বিস্ময়কর প্রতিভাশালী কবি একাধারে কবি, শিক্ষক, কাহিনিকার, ঐতিহাসিক, ভূবৃত্তান্ত লেখক ও নিবন্ধকার হিসেবে ধর্মকর্মের ব্যবস্থাদাতা ও আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থের লেখক ছিলেন।

লালন শাহ্ ফকিরের গান

লালন শাহ্

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি।।
দ্বি-দলের মৃণালে
সোনার মানুষ উজ্জ্বলে
মানুষ-গুরু কৃপা হ'লে
জানতে পাবি।।
এই মানুষে মানুষ গাথা
দেখ্না যেমন আলেক লতা
জেনে শুনে মুড়াও মাথা
জাতে তরবি।।
মানুষ ছাড়া মন আমার
পড়বি রে তুই শুন্যকার
লালন বলে, মানুষ-আকার
ভজলে তরবি।।

লালন-গীতিকা (৩৯১-পদসংখ্যা)

লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০) : জন্ম বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভাঁড়ারায় (মতান্তরে ঘোড়াই)। উদারধর্মীয় সাধক লালনের ধর্মীর পরিচয় নিয়ে মতান্তর আছে। ধর্মীয় ভেদাভেদ না-মানা লালন তাঁর বাউল গানের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক মানবতার বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর গানগুলির মধ্যে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'সবলোকে কয় লালন কী জাত', 'বাড়ির কাছে আরশিনগর' — প্রভৃতি আজও জনপ্রিয়। ঠাকুর পরিবারের জমিদারি শিলাইদহের প্রজা হওয়ায় তিনি তাঁদের সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন।

নুন

জয় গোস্বামী

আমরা তো অল্পে খুশি; কী হবে দুঃখ করে?
আমাদের দিন চলে যায় সাধারণ ভাতকাপড়ে।

চলে যায় দিন আমাদের অসুখে ধারদেনাতে
রাত্তিরে দু-ভাই মিলে টান দিই গঞ্জিকাতে

সব দিন হয় না বাজার; হলে, হয় মাত্রাছাড়া
বাড়িতে ফেরার পথে কিনে আনি গোলাপচারা

কিন্তু পুঁতব কোথায়? ফুল কি হবেই তাতে?
সে অনেক পরের কথা। টান দিই গঞ্জিকাতে।

আমরা তো এতেই খুশি; বলো আর অধিক কে চায়?
হেসে খেলে, কষ্ট করে, আমাদের দিন চলে যায়

মাঝে মাঝে চলেও না দিন, বাড়ি ফিরি দুপুররাতে
খেতে বসে রাগ চড়ে যায়, নুন নেই ঠান্ডা ভাতে

রাগ চড়ে মাথায় আমার, আমি তার মাথায় চড়ি
বাপব্যাটা দু-ভাই মিলে সারাপাড়া মাথায় করি

করি তো কার তাতে কী? আমরা তো সামান্য লোক
আমাদের শুকনো ভাতে লবণের ব্যবস্থা হোক।

জয় গোস্বামী : জন্ম ১৯৫৪, কলকাতায়। বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতিমান কবি। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কবিতার বই 'প্রত্নজীব', 'উন্মাদের পাঠক্রম', 'ভুতুমভগবান', 'ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?', 'বজ্রবিদ্যুৎখাতা', 'পাগলী তোমার সঙ্গে', 'সূর্য পোড়া ছাই', 'হরিণের জন্য একক', 'ভালোটি বাসিব', শিবির', 'গরাদ! গরাদ!' প্রভৃতি। 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' তাঁর স্বরণীয় কাব্য-উপন্যাস। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'সেই সব শেয়ালেরা', 'সুড়ঙ্গ ও প্রতিরক্ষা' প্রভৃতি। বাংলা আলোচনায় তাঁর লেখা 'আকস্মিকের খেলা', 'আমার রবীন্দ্রনাথ', 'গোঁসাইবাগান (তিন খণ্ড)' উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আগুন

বিজন ভট্টাচার্য

চরিত্রলিপি

পুরুষ

নেত্য

কৃষাণ

সতীশ

জুড়োন

হরেকৃষ্ণ

প্রথম পুরুষ

দ্বিতীয় পুরুষ

তৃতীয় পুরুষ

চতুর্থ পুরুষ

সিভিক গার্ড

মুসলমান

মুসলমান ভাই

ওড়িয়া

দোকানি

পুরুষের ছেলে

শ্রমিক

সতীশের সহকর্মী

মধ্যবিত্ত কেরানি

নেত্যর মা

কৃষাণি/কৃষাণের বউ

ক্ষিরি/সতীশের বউ

মনোরমা/হরেকৃষ্ণের বউ

প্রথম দৃশ্য

প্রত্যুষ কাল। অস্পষ্ট আলোয় কিছুই ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না। সাংসারিক টুকিটাকি জিনিসপত্তরগুলো দেখাচ্ছে আবছা আবছা। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মাঝখানে দেখা যায় একটা মেটে জালা। তারই গা ঘেঁসে একটা বাঁশের আলনার ওপর দেখা যায় ঝুলন্ত দু-একখানা নোংরা কাপড়, একটা ছেঁড়া চট আর একখানা পুরোনো ছেঁড়া কাঁথা। মেঝের উপর জন তিনেক লোক কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। খুব অস্পষ্ট নীল আলোয় স্টেজের এক পাশে এদেরকে দেখা যাচ্ছে। একটা মোরগ ডেকে উঠল। একজন একটু নড়েচড়ে পাশ ফিরল। ঘুমের ঘোরে কে যেন আপন মনেই বিড়বিড় করে উঠে চুপ করে গেল। মোরগটা আবার ডেকে উঠল। একটু চুপচাপ। দূর গাঁয়ের আজানের শব্দও কানে ভেসে আসছে। একটা কাক ডানা ঝাপটে ডেকে উঠল। আবার একটু চুপচাপ। মোরগটা আবার ডেকে উঠল। একটু পরে একটা হাই তোলার শব্দ কানে এল। মনে হল কে যেন আড়মোড়াও ভাঙছে।

পুরুষ (হাই তুলছে)। হা-া-া-উ-য়েঃ। (আড়মোড়া ভাঙল) ই-ঞ-ঞ-ঞ-ঞ-স্-...এইবার উঠতি হয়। আর শুয়ে থাকলি ওদিকি আবার সব গোলমাল হয়ে যাবেনে। বুঝিছো তো ঠেলাডা মণিচাঁদ কাল দেরিতে যাইয়্যে একদম সেই নাইনির পেছনে। ওদিকি চাল পাতি পাতি সেই বেলা বারোডা। তাতেও আবার কথা আছে, চাল পাবা কি পাবা না। হয় তো পালেই না। কুড়োনের মা তো দ্যাখলাম কাল শুধু হাতে ফিরে আল্যো।

একটা বিড়ি ধরায় লোকটা শুয়ে শুয়ে। অস্পষ্ট আলোয় বিড়ির আগুনের আনাগোনা বেশ সুস্পষ্ট।

— এই নেত্য, বলি চিৎপাত হয়ে ঘুমোচ্ছিস যে বড় আরামে। এদিকি ফরসা হয়ে আল্যো খেয়াল আছে। উঠে পড়। উঠে পড়। চাল আজ আর পাতি হবে নানে দেহিসখেন।

আবার একটু চুপচাপ। লোকটা পাশ ফিরে শুয়ে বিড়ি টানে। হঠাৎ উঠে বসে গা ঝেড়ে

—নাঃ, এই রহম ভাবে সময় নষ্ট করলিই হইছে আর কি! (পাশের ঘুমন্ত স্ত্রীলোকটির গায়ে ঠেলা মারে।) হ্যাদে ও নেত্যর মা, ওঠ এইবেলা। আর কত ঘুমুবি ক' দিনি। কলমি শাক, দাঁতন কাঠি আর কলাটলা ঝা কিছু রাখিছিস খপ করে গোছায়ে নে। ঐগুলো বিক্রি কর্যে শেষ পরে তো নাইনি গে চাল কিনবি। ঝত সকালে যাবি ততই ভালো। নে উঠে পড়, আর দেরি করিস নে...কই। উঠলি নে এহনও। তো থাক শুয়ে তোরা, আমি চল্লাম।

গামছাখানা বার দুয়েক ঝেড়ে কাঁধের ওপর ফেলে লোকটা ব্যস্তভাবে বেরিয়ে পড়ে। একটু পরেই উঠে বসে নেত্যর মা। নেত্যর গায়ে ঠেলা মেরে বলে

নেত্যর মা নিতাই, নিতু! ও বাবা নেত্য। নে, উঠে পড় বাবা এইবেলা।

একটা মোরগ ডেকে উঠল দূরে। একটা কুকুর ডাকছে শোনা যায়।

নেত্য (আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে)। কি হইছে কি সকালবেলাই। আচ্ছা তাল হইছে রোজ সকালে। একটু ঘুমোনোর জো নেই। কী এক নাইনির তাল হইছে।

নেত্যর মা ঘুমোসখন বাবা, ঘুমোসখন। দুপুরবেলা ঘুমোসখন। এখন চল নে উঠে পড় খপ করে।

নেত্যর মা তাড়াতাড়ি ওর বাজারের সওদাগুলো একটা ঝুড়িতে গোটো করে আনে। কলমি শাকগুলোর ওপর নেত্যর মা বার-দুয়েক জলের ছিটে দিয়ে দেয়। তারপর ছেলেকে নিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যটা শেষ হতেই অস্পষ্ট নীল আলোর ফোকাসটা দ্বিতীয় দৃশ্যের ওপর এসে পড়ে।

একখানা চালাঘর। সামনে একফালি উঠোন। ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে একজন কৃষাণি। আর বাইরের খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে জনৈক কৃষাণ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গুটানো। মাথায় গামছা ফেটা বাঁধা। হাতের কাস্তে দিয়ে পিঠ চুলকাচ্ছে।

কৃষাণ এই আর কডা দিন বউ, বুঝলি। তারপর কলেকষ্টে এই চৈতেলির ফসলগুলো মাচায় তুলতি পারলি হয়, কিছুদিনের মত নিশ্চিন্দি, কী বলিস।... ওমা, তা কথা কইতি কী হচ্ছে তোর, মুখপানে চাইয়্যে শুধু দাড়ায়ে আছিস। (ঈষৎ হেসে) ও রকম করে চাইস নে, সকাল বেলাই কাজ পণ্ড করিসনে বউ, এই কয়ে দেলাম।

বউ দুলে ওঠে

—এই চৈতেলির ফসলডা মাচায় তোলবো...না থাক, আর বলে কী হবে। মনে মনে এ পয্যন্ত তো কত কিছু করবো বলে ঠিক করলাম, পাল্লাম কই এখনতরি। দেখি...। আর কটা দিন একটু কষ্ট কর। (পেছন ফিরে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ায়) আর দ্যাক, একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস। মাঠের থে ফিরে এসে ধড়ে যেন প্রাণ আর তিষ্ঠুতি চায় না। তুই আসবি সেই দুটোয়, তারপর রাঁধবি। তারপর খাব। একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস। কেষ্টর মার সঙ্গে সকাল সকাল গে নাইনির একেবারে পেরথমে দাঁড়াতি পারিস নে!

বাইরে একটা গোরু হামলে উঠল। কৃষাণ গোরুকে লক্ষ করে বলে

—আরে রও যাই, মাঠে যাবার জন্যি একেবারে পাগল হয়ে উঠেচো এর মধ্যি। (বউ এর প্রতি) তা ওই কথা, বুঝলি। কেষ্টর মা-র সঙ্গে আগেভাগে গে নাইনির একেবারে সে পেরথমে দাঁড়াবি। (একটু হেসে) ফের আবার ওই রকম করে তাকাচ্ছিস মুখপানে।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দৃশ্যান্তর হতেই নীল আলোর ফোকাসটা সট করে সরে গিয়ে অন্য দৃশ্যের ওপর গিয়ে পড়ে।

দূরে কলের ভোঁ শোনা যাচ্ছে। আর এদিকে ছোটো একটা বারান্দার ওপরে উবু হয়ে বসে আছে সতীশ। কারখানার জনৈক শ্রমিক। কাক ডাকছে সকালবেলা। ঘরের ভেতর ঘুমুচ্ছে সতীশের বউ, মেয়ে। তাদের দেখা যাচ্ছে না, সতীশ বারান্দার ওপর বসে আপন মনে বিড়ি টেনে চলেছে। খালি গা, মাথার চুল উস্কোখুস্কো—মজবুত শরীর। বিড়িটা শেষ করে ফেলে দিল তার সামনে। তারপর মাথার চুলের মধ্যে হাত গুঁজে বসল। একটু পরে ঘাড় বেঁকিয়ে ও তার ঘুমন্ত মেয়েকে লক্ষ করে বলে ওঠে

সতীশ আরে এ ফুলকি! ফুলকি উঠলি! বাপরে ঘুম! যে যেমনি মা তার তেমনি বেটী। কুম্ভকর্ণ আর বলে কাকে। সেই সাঁঝের বেলায় শুইছিস বিছানায়! (একটু কাশে)

একটু পরে সতীশ তার সহকর্মীকে ডাকে

আরে জুড়োন! জুড়োন উঠেছিস!

বাইরে থেকে উত্তর আসে—আরে বোল না বে।

—তা কি যাচ্ছিস নাকি কাজে?

জুড়োন আরে হাঁরে। তুই? তুই কারখানায় যাচ্ছিস না?

সতীশ আরে কারখানায় যাব না তো যাব কোন চুলোয়। কিন্তু এদিকে যে ভারি মুশকিলেই পড়লাম।

জুড়োন মুশকিলটা সে কী হল?

সতীশ আরে সে কী বলব মুশকিলের কথা। তোর কী, একলা মানুষ, খাচ্ছিস দাচ্ছিস ফুর্তি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। দু-চার পয়সা বেশি দিয়ে হয়তো হোটেলেই খেয়ে নিলি কিন্তু আমার যে সেটি হবার উপায় নেই। শালা এই চালডালের কী উপায় করি রে বোলতো!

জুড়োন কেন রে। সে লাইনে দিচ্ছে না।

সতীশ আরে দুত্তোর নিকুচি করল তোর লাইনের। লাইনে তো বরাবরই দিচ্ছে, কিন্তু সে আবার শুধু হাতে ফিরে ভি আসতে হচ্ছে। কাল সারাটা দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুলকি আর ওর মা তো শুধু হাতে ফিরে এসেছে। রাত্তিরে এসে শেষে মিস্ত্রির কাছ থেকে প' দেড়েক চাল কর্জ লিয়ে এসে তো পিত্তি রক্ষে করি। এখন সকালবেলাই তো আবার পেটে আগুন লেগে গেছে। শালা খিধে পেটে লিয়ে কি কাজে যেতে মন লাগে। যেমন হয়েছে শালা কোম্পানি, তিনমাস হল রোজই চাল ডাল দিচ্ছে। শালা কী করতে ইচ্ছে করে বোল তো!

জুড়োন তুই বুঝি কোম্পানির ভরসা করে আছিস। তা হলেই সে হয়েছে।

সতীশ কেন বোলতো। এ তুই বলছিস কি! কোম্পানির ভরসা করব না, দোকানের ভরসা করব না, সে গাঁটের পয়সার ভি ভরসা করব না, তো কাকে ভরসা করি বোল!...শালা কারবারে ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে

হেই ফুলকি আরে নিকুচি কোরলো তোর ঘুমের। বলি তোদের ঘুমের জন্যে কি কারখানার গেট খোলা থাকবে নাকি? সেই কবে থেকে ডাকছি। বলছি কি আছে দে দুটো খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। যেয়ে ঠেলতে হবে তো আবার ঘানি সারা দিনমান।

ফুঁসে ওঠে ওর বউ ক্ষিরি

ক্ষিরি ঠেলতে হবে তা মেয়েমানুষ কী করবে শুনি? নিজে হাতে করে আনলে তো কাল দেড় প' চাল কর্জ করে। তার ভেতরে এক প' চালের ভাত তো নিজেই খেলে। এখন সকালবেলাই তোমার পিণ্ডি জোগাই কোত্থেকে বলতো। খামকা চেঁচাচ্ছ ভোরবেলা।

সতীশ ও, খামকা চেঁচাচ্ছি দেখলি তুই! তোর ক্ষিরি আজকাল বড়ো ট্যাকট্যাকানি কথা হয়েছে। তোর সে মুখের সাজা কিন্তু আমি একদিন আচ্ছা করে দিয়ে দেব।

ক্ষিরি (উত্তেজিত হয়ে)। কী বাকি রেখেচ। পরনে নেই কাপড়, পেটে নেই ভাত, বড়ো সুখেই রেখেচ। আবার লম্বা চওড়া কথা। লজ্জা করে না। পুরুষমানুষ তোমাকেই এই পেরথম দেখলাম। দেখে এসোগে, কেলোর বাবা কেলোর মাকে কী হালে রেখেছে। কী আমার পুরুষমানুষ রে!

সতীশ দেখ, মুখ সামলে কথা বলিস ক্ষিরি, এই বলে দিলাম। নইলে... (লাথি মারল।)

ক্ষিরি (আর্তনাদ)। ওরে বাপরে গেলাম গো, মেরে ফেললে গো...(ফুলকিও কেঁদে ওঠে।)

সতীশ তোর মুখের সাজা আমি আজ ভালো করে দিয়ে যাব। হারামজাদি।

মা-মেয়ের সমবেত চিৎকার শোনা যেতে থাকে।

যা, মরগে যা।

ছিটের হাফ শার্ট চাপিয়ে কাঁধের ওপর গামছা ফেলে সতীশের বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নীল আলোর ফোকাসটা এবার আরও একটু উজ্জ্বল মনে হয়। সট করে ফোকাসটা দৃশ্যান্তরের ওপরে গিয়ে পড়ে।

মধ্যবিত্ত পরিবার। একটুখানি পরিচ্ছন্ন সুস্থ পরিবেশ। অন্তপুরের দৃশ্য। কেরানি হরেকৃষ্ণবাবু স্ত্রী মনোরমার সঙ্গে কথা কইছেন।

হরেকৃষ্ণ চা নেই, চিনি নেই, চাল নেই, খালি আছে চুলোটা। তাও আবার কয়লার অভাব। কী করি বলতো!

মনোরমা দেখ বাপু, আজ আবার একটু কষ্ট কর। ভোঁদার কাছে শুনলুম আজ নাকি দু সের করে দেবে।

হরেকৃষ্ণ আহা দেবে তো বুঝলাম, কিন্তু যাই কখন বলতো। এদিকে বেলা দশটার মধ্যে অফিস, আর তোমার সেই লাইনে বেলা বারোটার এধারে তো কিছু পাবার আশা নেই। আর তাও যে পাব তারও কোনো স্থিরতা নেই। দোকানি হয়তো শেষকালে হাত উলটে বলবে—ফুরিয়ে গেছে।...মহা মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি।

মনোরমা কেন, অফিস থেকে যে চাল ডাল দেবার কথা ছিল।

হরেকৃষ্ণ থাক, আর অফিসের কথা তুলো না বাপু। একেবারে ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।

মনোরমা কেন, এই না শুনলুম তোমার মুখ থেকে সেদিন যে অফিস থেকে বাবুদের সব দেওয়া থোওয়ার ব্যবস্থা হবে, তার কী হল!

হরেকৃষ্ণ (বিরক্ত হয়ে)। সে সব কেলেঙ্কারির কথা আর বোলো না গিন্নি। বাবুদের নামে শস্তা দরে চাল ডাল এনে কর্তারা আবার সেগুলো চড়া দামে বাজারে ছাড়ছেন। ব্যবসা, খালি ব্যবসা। এদিকে লোকে জানছে যে আমরা খুব শস্তা দরে চাল ডাল পাচ্ছি। আসলে কিন্তু তার সুবিধে ভোগ করছে ম্যানেজার আর তার মোসাহেবরা। যে রক্ষক সেই হল গিয়ে তোমার ভক্ষক। কাকে কী বলবে বল? হয়েছে যত সব চোর ছেঁচড়ের আড্ডা।

মনোরমা দ্যাখ যদি সেদিনকার মতো সিভিক গার্ডকে বলে কয়ে কিছু চিনি জোগাড় করতে পারো।

হরেকৃষ্ণ (চোখ বড়ো বড়ো করে)। কিন্তু চাল, চালের কী হবে!...দেখি, দাও টাকাটা, ঘুরে আসি। মিছে ভেবেই কি কিছু বার করতে পারবো! (গমনোদ্যত)

মনোরমা (পেছন থেকে)। ওকি, ঠাকুর নমস্কার করে বেরুলে না!

হরেকৃষ্ণ (একটু থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে)। সুবিধে হবে বলে মনে করছ, আচ্ছা!

দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে হরেকৃষ্ণবাবুর প্রস্থান

ড্রপ

পঞ্চম দৃশ্য

দিবালোকে সব কিছু সমুজ্জ্বল। সারবন্দি একটা কিউ স্টেজের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে দোকানের সামনে গিয়ে মিশেছে। হট্টগোল চলছে লাইনে। নানা সমস্যা নিয়ে নানান জনের গবেষণা। মুখর পরিবেশ।

হরেকৃষ্ণ উড়িষ্যা থেকে নাকি লক্ষ লক্ষ মন চাল এসে পড়েছে। এ চাল উঠল কোথায়!

সামনের একজন লোক তার সামনের একজন ওড়িয়াকে দেখিয়ে দিয়ে বলেয

১ম পুরুষ এই যে মশাই, একে জিজ্ঞেস করুন। কিরে বল না। তোদের দেশেরই তো চাল।

ওড়িয়া কঁড় কউচি।

১ম পুরুষ কথাও বুঝিস না এখনও। আরে তোর দেশের থেকে যে চাল আসবার কথা ছিল তার কী হল বুড়োবাবু তাই জিজ্ঞেস করছেন। চাল এসেছে না স্রেফ তাল মারলি।

হরেকৃষ্ণ না তা ও তার খবর কোত্থেকে রাখবে বলুন!

ওড়িয়া সে মো বলি পারিব না।

১ম পুরুষ বলি পারিব না তো থাক দাঁড়িয়ে রোদ্দুরের মধ্যে। হুঁ, বেশ তো থাকতিস বাবা দেশঘরে। কেন খামোকা মরতে এলি।

ওড়িয়া (হেসে)। চাউড় তো পোয়া যাইছে না বাবু।

হরেকৃষ্ণ সেই কথাই তো বলছি। এত চাল গেল কোথায়!

সহসা দোকানের দরজা খোলে। মোটা নাদুস-নুদুস তেল কুচকুচে দোকানি। ফতুয়ার নীচে ওর ভুঁড়িটা স্বপ্রকাশ। দোকানের সামনে গঙ্গাজল ছিটোচ্ছে। ক্যাশবাক্সের ওপর জ্বলছে ধুনুচি। সিদ্ধিদাতা গণেশকে একটা পেন্নাম জানিয়ে দাঁড়িপাল্লায় আঙুল ঠেকিয়ে মাথায় ছোঁয়ায়। তারপর দোকানি তার গদিতে চেপে বসে। দরজার পাল্লায় লটকানো বিজ্ঞাপন — খুচরা নাই। সঙ্গে সঙ্গে লাইনে সাড়া পড়ে যায়। সিভিক গার্ড ঘুরে যায় একবার লাইনের সামনে দিয়ে।

সিভিক গার্ড এই সব টিকিট আছে তো? নইলে কিন্তু চাল মিলবে না বলে দিচ্ছি।

হরেকৃষ্ণ ক সের করে দেবে মশাই?

সিভিক গার্ড যখন দেবে তখন দেখতেই পাবেন, খুচরো পয়সা সঙ্গে রেখেছেন তো!

১ম পুরুষ আমার কাছে কিন্তু টাকা।

সিভিক গার্ড ভাঙিয়ে নিয়ে আসুন মশাই। ও টাকা ফাকার চেঞ্জ দেওয়া চলবে না।

১ম পুরুষ চলবে না আপনার কোন আইনে লেখা আছে মশাই সকলের কাছেই যে খুচরো থাকবে এমন কি কোনো কথা ছিল!

সিভিক গার্ড না থাকে তো নেবেন না চাল। ও সব আইনের কথা বলবেন আদালতে গিয়ে—এখানে নয়।

হঠাৎ সিভিক গার্ড বোঁ করে ছুটে গিয়ে একটা লোককে লাইন থেকে হিঁচড়ে টেনে বার করল।

সিভিক গার্ড ই য়েঃ—ঃ—ঃ বাইরে থেকে এসেই ভেতরে ঢুকে পড়ছ নবাবপুত্তুর!

২য় পুরুষ আমি তো আগে থেকেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি মশাই জিজ্ঞেস করুন না এই পাশের লোককে, কী মশাই, ছিলাম না আমি এইখানে দাঁড়িয়ে, বলুন তো?

৩য় পুরুষ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও এইখানেই দাঁড়িয়েছিল ছেড়ে দিন ওকে।

২য় পুরুষ সেই ভোর পাঁচটা থেকে আমি বলে ঠিক এই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। আর বলে কিনা ছিলাম না, আচ্ছা তো জুলুম দেখি, কী করি এখন!

সিভিক গার্ড কী করি এখন! কেন লাইন ছেড়ে বাইরে যেতে বলেছিল কে? কেন ছেড়েছিলেন লাইন?

২য় পুরুষ কী মুশকিল তারও কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?

সিভিক গার্ড তা হবে না! কোথাকার লোক কোত্থেকে এসে ভিড়ে পড়ল জানতে হবে না, কেন, আগে থেকে সেরে আসতে কী হইছিল—এই খবরদার!

সিভিক গার্ড হঠাৎ আবার অন্যদিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। গিয়েই ঝট করে দুঃস্থ চেহারার একটা লোকের গালের ওপর চপেটাঘাত করে বসেছে

সিভিক গার্ড চালাকি পেয়েছ! লুটের মাল, না! বার বার ঢুকছ, বেরুচ্ছ, বেরুচ্ছ, ঢুকছ। মামার বাড়ির আবদার আর কী। কোথায় চাল জমা করেছ দেখাবে চল। তোমায় আমি পুলিশে দেব, দাঁড়াও।

৪র্থ পুরুষ (কাঁচুমাচু মুখ করে)। এ কী বলছেন আপনি! লাইন ছেড়ে গেছি! আমি! কী আশ্চর্য!

সিভিক গার্ড চুপ চুপ! আবার ন্যাকা ন্যাকা কথা। কিছু দেখতে পাইনে মনে করেছ, না!

তৃতীয় পুরুষ কেন বেচারিকে খামখা মারধোর করছেন মশাই। লাইন ছেড়ে ও তো কোথাও যায়নি। এই আমারই সামনে তো ঘণ্টাখানেক ধরে লোকটাকে ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি। ছি, ছি, এসব কী অত্যাচার।

সিভিক গার্ড নিজের চোখকে আপনি মশাই আমায় অবিশ্বাস করতে বলেন।

৩য় পুরুষ হ্যাঁ, তাই বলি। নজরটাও কি আপনার একচোখে? চোখতো আমাদেরও আছে নাকি! যে ঢুকেছে আপনি তাকে ধরতে না পেরে একজন নির্দোষ লোককে খামখা মারধোর করলেন!

মুসলমান ওর কী দোষ আছে মশাই যে আপনি মেরে বসলেন?

৩য় পুরুষ ওঃ, সিভিক গার্ড হয়েছেন তো একেবারে মাথা কিনে নিয়েছেন।

সিভিক গার্ড এয়োপ! মুখ সামলে কথা বলো বলছি।

৩য় পুরুষ কী আপনি মুখ সামলাতে এসেছেন মশাই? চাল নিলে একজন আর আপনি অন্য একজনকে ধরে পিটে দিলেন! কেন, এ কোন দিশি শাসন মশাই?

৪র্থ পুরুষ আমি বাবা কিছুই জানিনে। সেই সকাল থেকে বলে দাঁড়িয়ে আছি দুটো চালের জন্যে।

৩য় পুরুষ লোকে পয়সা দিয়ে চাল নেবে, তার আবার ফুটুনি দেখ না! কেন আপনি মিথ্যি মিথ্যি ওকে বার করে দিলেন বলুন তো? সেই পাঁচ ছ ক্রোশ দূর থেকে এসেছে বেচারি দুটো চালের জন্যে, উনি দিলেন তাকে বের করে।

সিভিক গার্ড দোষী কি নির্দোষী সে কৈফিয়ত তো আমি আপনার কাছে দেব না। আপনার যদি দরদ থাকে তো দেবেন না আপনার চালটা ওকে।

৪র্থ পুরুষ (সিভিক গার্ডকে)। দাও না বাবা আমায় লাইনে ঢুকতে। সত্যি বলছি আমি একবারও চাল নেইনি। বিশ্বাস কর বাবা। তিনটি প্রাণী দুদিন অনাহারে আছি বাবা, দয়া কর।

সিভিক গার্ড ওঃ গা আমার একেবারে জল করে দিলে রে। যা যা, ন্যাকামি করতে হবে না। যা নিইছিস তাই খাগে, যা, ভাগ।

৪র্থ পুরুষ (আহত হয়ে ক্ষোভে)। আমি চাল নেইনি।

সিভিক গার্ড এই ওপ!

৪র্থ পুরুষ (ধড়টা ওর কাঁপছে)। আমি নেইনি চাল। দেখুন মশাই আপনারা সব, আমি চাল নেইনি, তবু আমায় চোর বলছে, আমি চোর নই।

হরেকৃষ্ণ আরে বাবা লাইনে ঢুকতে দিচ্ছে না তো যা না গিয়ে আবার পেছনে দাঁড়াগে, চাল পাওয়া নিয়ে তো কথা।

৩য় পুরুষ ওঃ খুব যে দরদ দেখি। যান না আপনি গিয়ে পাঁচশো লোকের পেছনে দাঁড়ান গে।

সিভিক গার্ড এই, গোলমাল করবেন না বলে দিচ্ছি। চাল নিতে হয় তো চুপচাপ লাইনে থাকুন। পরের জন্যে দরবার করতে হবে না আপনাকে।

৪র্থ পুরুষ কেন, উনি তো ঠিকই বলছেন।

সিভিক গার্ড থাক, তোকে আর দালালি করতে হবে না। যা ভাগ্ ভাগ্।

৪র্থ পুরুষ (অপমানিত হয়ে)। আমি কুকুর নই।

সিভিক গার্ড মানুষ নাকি!

৪র্থ পুরুষ চাল দেবে না দিও না, কিন্তু তাই বলে যা তা বোলো না বলছি।

সিভিক গার্ড মেজাজ নাকি!

৪র্থ পুরুষ আলবাৎ, জানোয়ার কাঁহাকা

সিভিক গার্ড লোকটিকে ঘুসি মারতে উদ্যত হয়। সঙ্গে সঙ্গে লোকটিও ওকে জাপটে ধরে। লাইন ভেঙে তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়, মার শালা, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে ফেল, পুলিশ, পুলিশ প্রভৃতি নানা রকম ধ্বনি শোনা যায়। এগিয়ে আসে জনৈক যুবক হন্তদন্ত হয়ে।

যুবক আগুন! আগুন!

হঠাৎ গোলমালটা থেমে যায়

১ম পুরুষ কোথায় আগুন?

সিভিক গার্ড আগুন! আগুন কিসের!

হরেকৃষ্ণ আগুন আবার লাগল কোথায় বাবা এর মধ্যে!

যুবক (হাতজোড় করে) আগুন! আগুন জ্বলছে আমাদের পেটে।

হরেকৃষ্ণ তবু ভালো। আমি ভাবলাম বলি...।

সিভিক গার্ড ওঃ খুব যে বক্তিমে দিচ্ছেন! সামলান না তাল একবার দেখি।

সিভিক গার্ডের দোকানের দিকে প্রস্থান। ওদিকে চলমান কিউ সরে সরে যাচ্ছে। যে যার মতো চাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। লুঙ্গিপরা জনৈক মুসলমান ভাই চাল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মুসলমান ভাই (দোকানিকে)। আজ চাল ঠিক আছে তো মশাই? কেউ ফাঁক যাবে না তো? দেখবেন।

দোকানি সে খোঁজে তোমার দরকার কী কত্তা। তুমি তো পেয়েছ, যাও, ভালোয় ভালোয় কেটে পড়। ...বাব্বা! লুঙ্গি, টিকি, পৈতে, টুপি সব একাকার হয়ে গেছে। আর কি উপায় আছে। ব্যবসার সুখ এই গেল। ওরে ও পঞ্চা, নে বস্তা কেটে চাল ঢাল চটপট।

ওড়িয়া (কোঁচড়ে চাল বেঁধে সহাস্য মুখে)। মুশকিলের কথা তো দাদা সেই হইল। যে হিন্দু অছি সেও চাল খাইব, আর যে মুসলমান অছি সেও চাল খাইব। সাহেব লোকও খাউচি, গুঁড়া করি পাউরুটি বনায়েরে খাউচি। সব্ব চাউড় খাউচি। এবে সব্ব এক হৈ গিলা। চাউড়ের কথা বড় মস্ত কথা আছে রে দাদা। তো তুমার বাণিজ্য আর চলিব কেমতি।

দোকানি যা বাবা যা, কেটে পড়, কেটে পড়। (সিভিক গার্ডের দিকে চেয়ে) হাতি যখন নোদে পড়ে চামচিকে তায় লাথি মারে; তা আমারও হয়েছে সেই দশা।

ওড়িয়া লাইন থেকে একটু দূরে বসে কোঁচড়ে চাল বাঁধছে, এর মধ্যে হঠাৎ 'কিউ' থেকে চাল নিয়ে বেরিয়ে এলেন হরেকৃষ্ণ। ওড়িয়াকে লক্ষ করে

হরেকৃষ্ণ এই যে, বড্ড খাঁটি কথা বলেছ হে। বড্ড খাঁটি কথা হেঃ হেঃ।

হঠাৎ পেছন থেকে প্রথম পুরুষ চাল নিয়ে এসে দাঁড়ায়

১ম পুরুষ না, আমরা অনেকেই হয়তো হাস্‌লুম ওর কথায় বুঝলেন, কিন্তু ওর ওই সোজা কথাটা আমরা আজও অনেকেই বুঝি না।

হরেকৃষ্ণ ঠিক, অতি ঠিক (হঠাৎ ৪র্থ পুরুষকে দেখে) এই যে, তবে পেয়েছেন বাবা চাল?

৪র্থ পুরুষ (চালের পুঁটুলি দেখিয়ে)। হ্যাঁ বাবা, পেইছি।

হরেকৃষ্ণ তখন পেছনে দাঁড়াতে বলেছিলাম বলে কিছু মনে করো না যেন ভাই, কোনো কিছু মনে করে আমি তোমায় ওকথা বলিনি।

৪র্থ পুরুষ — না, না, আমি কিছু মনে করিনি।

হরেকৃষ্ণ — সমস্যা সব্বার। এই তো দ্যাখো না সামান্য দু সের চালের জন্য কি নাজেহালটাই না হতে হচ্ছে। আচ্ছা বল, একথা কি ভেবেছি কোনোদিন, স্বপ্নেও। তা আজ আর কারো গর্বের কিছু নেই রে দাদা। তাই বলছি, কিছু মনে করে আমি তোমায় ও কথা...

৪র্থ পুরুষ — (আন্তরিকতায় হরেকৃষ্ণর হাত ধরে)। না না, কেন আপনি বলছেন ও কথা বারবার। বলছি তো, আমি কিছু মনে করিনি।

৩য় পুরুষ — আর মনে করাকরিই বা কেন। যথেষ্ট তো হয়েছে। এখন বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে মিলিমিশে থাকতে হবে ব্যাস্।

হরেকৃষ্ণ — (বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে)। এই বুঝটাই এখন দরকার।

৩য় পুরুষ — তা ছাড়া উপায় নেই, কোনো উপায় নেই।

ঘাড় নাড়তে নাড়তে হরেকৃষ্ণ, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ এবং ওড়িয়ার প্রস্থান।

ওদিকে চলমান কিউ সরে সরে চলেছে। একজনের পর আর একজন চাল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। লাইনটা ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে।

ড্রপ

বিজন ভট্টাচার্য : (১৯০৬-১৯৭৮) নাট্যকার, অভিনেতা। ফরিদপুর জেলার খানখানাপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক বিজন ভট্টাচার্য গণজীবনের সংগ্রাম ও দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ-বঞ্চনা, প্রগতিশীল চিন্তা ও সমাজবোধ নিয়ে নাটক রচনা করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তবে তাঁর শেষজীবনে রচিত নাটকে মার্কসীয় দর্শন, হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সংমিশ্রিত হয়েছে। তিনিই প্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চকে পুরাণ ও ইতিহাসের রোম্যান্টিক প্রভাব থেকে মুক্ত করেন। তাঁর প্রথম নাটক আগুন (১৯৪৩) নাট্যভারতীতে অভিনীত হয়েছে। পরে তিনি রচনা করেন জবানবন্দী (১৯৪৩); এটি কৃষকজীবনের আলেখ্য। তাঁর প্রতিভার সার্থকতম নিদর্শন হলো নবান্ন (১৯৪৪) নাটক; বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারির পটভূমিকায় রচিত এই নাটকে দুঃস্থ-নিপীড়িত কৃষকজীবন প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৪৮-৫০ সময়ে বিজন ভট্টাচার্য বোম্বাই চলচ্চিত্রে অভিনয় ও ফিল্মস্ক্রিপ্ট লেখার কাজও করেন। ১৯৭৮ সালের ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বই কেনা

মাছি-মারা-কেরানি নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময় উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায় আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এক সঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমত—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, ভবযন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশি হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল— আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

Here with a loaf of bread
beneath the bough,
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্‌তের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেননি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'অল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—*The Book*.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেইটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস্। এর বেশি আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো য়ায়, তবে আরো অনেক বেশি বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশি ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ, ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষ সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপি হাতী দেখতেহয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একধারে producer এবং consumer—তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগরেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer : আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই produce করেছি—কেউ কেনে না বলে আমি consumer. অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

* * *

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই , বলছো ঠিকই— কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে; আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত। তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর। আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হল টাকা। সে ফল

যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—বই পড়তে পারে না।'

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ, ই, ডি দিয়ে 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।'

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সন্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জৎ করতে চায়, তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সরে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদের পিছনে— গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ করে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মুর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েননি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়ে ছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা-কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকিট বিক্রি হয়েছিল!)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেন নি।

* * *

আর কত বলবো? বাঙালীর কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে! বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোন দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে?

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

আজব শহর কলকেতা

আজব শহর কলকেতা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। বুড়ো হতে চললুম তবু তার প্রমাণ পেলুম কমই। তাই নিয়ে একখানা প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখব ভাবছি এমন সময় নামল জোর বৃষ্টি। সমীরণে পথ হারানোর বেদনা বেজে উঠল কারণ যদিও পথ হারাইনি তবু সমস্যাটা একই। ছাতা নেই, বর্ষাতি নেই, ট্রামে চড়বার মত তাগদও আর নেই— বাস মাথায় থাকুক, — ট্যাক্সি চড়তে বুক কচ কচ করে; কাজেই বাড়ি ফেরার চিন্তার বেদনাটা 'পথহারানোর' মতই হল। এমন সময় সপ্রমাণ হয়ে গেল 'কলকেতা আজব শহর'— সামনে দেখি বড় বড় হরফে লেখা 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ!'

খেয়েছে! নিশ্চয়ই কোনো ফরাসী পথ হারিয়ে কলকাতায় এসে পড়েছে আর যে দুটি পয়সা ট্যাঁকে আছে তাই খোয়াবার জন্য ফরাসী বইয়ের দোকান খুলেছে! বাঙালী প্রকাশকরা বলেন, 'শুধু ভালো বই ছাপিয়ে পয়সা কামানো যায় না, রদ্দি উপন্যাসও গাদা গাদা ছাড়তে হয়।' কথাটা যদি সত্যি হয় তবে শুধু ফরাসী বই বেচে এ দোকান মুনাফা করবে কি প্রকারে? তাই আন্দাজ করলুম, এই 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ' বোধ হয় হাতীর দাঁতের মত— শুধু দেখবার জন্য, চিবোবার জন্য অন্য দাঁত রয়েছে লুকানো অর্থাৎ দোকানের নাম বাইরে যদিও 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ', ভিতরে গিয়ে পাবো অন্য মাল,— 'খুশবাই', 'সাঁঝের পার', 'লোধ্র রেণু', 'ওষ্ঠ-রাগ'।

সেই ভরসায় ঢুকলুম। বৃষ্টিটাও জোরে নেমেছে! না। আজব শহর কলকেতাই বটে। শুধু ফরাসী বই বেচেই লোকটা পয়সা কামাতে চায়! গাদা গাদা হলদে আর সাদা মলাটওলা এন্তার ফরাসী বই, কিছু সাজানো-গোছানো, কিন্তু যত্রতত্র ছড়ানো। ফরাসী দোকানদার কলকাতায় এসে বাঙালী হয়ে গিয়েছে। বাঙালী দোকানদারেরই মত বইগুলো সাজিয়েছে।

আপনাদের আশীর্বাদে আর শ্রীগুরুর কৃপায় তখন ব্যাকরণকে গঙ্গাযাত্রায় বসিয়ে, উচ্চারণের মাথায় ঘোল ঢেলে চালালুম আমার ধেনো মার্কা ফরাসী শ্যাম্পেন। মেমসাহেব খুশ। আম্মো তর।

অতি সযত্নে তিনি আমার বইয়ের ফর্দ টুকে নিলেন, বই আসা মাত্র আমায় খবর দেবেন সে ভরসাও দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপারে বিদেশীর সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা কইতে পাওয়ার আনন্দে সুখ-দুঃখের দু'চারটা কথাও বলে ফেললেন। মাত্র তিন মাস হল এদেশে এসেছেন, তাই ইংরিজী যথেষ্ট জানেন না, তবে কাজচালিয়ে নিতে পারেন, বইয়ের দোকান তাঁর নয়, এক বান্ধবীর, তার অনুপস্থিতিতে সুদ্ধমাত্র ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার কামনায় দোকানে বসেছেন।

তুলসীদাস বলেছেন— ‘পৃথিবীর কি অদ্ভুত রীতি। শুঁড়ি দোকানে জেঁকে বসে থাকে আর দুনিয়ার লোক তার দোকানে গিয়ে মদ কেনে। ওদিকে দেখ, দুধওয়ালাকে ঘরে ঘরে ধরা দিয়ে দুধ বেচতে হয়।’

বুঝলুম কথা সত্যি। এতদিন পৃথিবীর লোক প্যারিসে জড়ো হত ফরাসী বেচবার জন্য।

সে কথা থাক্। ইতিমধ্যে একটি বাঙ্গাল ছোকরা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, ‘কমার্শিয়াল আর্ট সম্বন্ধে কোন বই আছে কিনা? আমার মনে বড় আনন্দ হল। বাঙালী তাহলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। ফরাসী ভাষায় কমার্শিয়াল আর্টের বই খুঁজছে।

ততক্ষণে আমি একটা খাসা বই পেয়ে গিয়েছি। ন্যুরনবর্গের মোকদ্দমায় যেসব দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গিয়েছিল, তাই দিয়ে গড়া হিটলার চরিত্রবর্ণন। হিটলার সম্বন্ধে তাঁর দুশমন ফরাসীরা কি ভাবে তারও পরিচয় বইখানাতে আছে। এ বইখানার পরিচয় আপনাদের দেব বলে লেখাটা শুরু করেছিলাম, কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা শেষ হতে না হতেই ভোরের কাক কা-কা করে আমায় স্মরণ করিয়ে দিলে, ‘কলম ফুরিয়ে গিয়েছে’। আরেক দিন হবে।

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলুম, তাই যদি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেখি তাহলে আশা করি, সুশীল পাঠক এবং সহৃদয়া পাঠিকা অপরাধ নেবেন না।

রবীন্দ্রনাথ উত্তম উপন্যাস লিখেছেন, ছোট গল্পে তিনি মপাসাঁ, চেখফকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, নাট্যে তিনি যে-কোনো মিস্‌টিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, কবিরূপে তিনি বিশ্বজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন, শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করেছেন তার গভীরতা পণ্ডিতদের নির্বাক করে দিয়েছে, তাঁর রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি আরো কত বৎসর ভারতবাসীকে নব নব শিক্ষা দেবে তার ইয়ত্তা নেই, আর গুরুরূপে তিনি যে শান্তিনিকেতন নির্মাণ করে গিয়েছেন তার স্নিগ্ধছায়ায় বিশ্বজন একদিন সুখময় নীড় লাভ করবে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এসব উত্তীর্ণ হয়ে অজরামর হয়ে রইবেন তাঁর গানের জন্য।

সুরের দিক দিয়ে বিচার করব না। সুহৃদ শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে' এমন কোন জিনিস বাদ দেননি যে সম্বন্ধে আপনি আমি আর পাঁচজনকে কিছু বলে পারি। আমি বিচার করছি, কিংবা বলুন, মুগ্ধ হয়ে ভাবি যে, কতকগুলো অপূর্ব গুণের সমন্বয় হলে পর এ রকম গান সৃষ্ট হতে পারে। সামান্য যে দু'চারটে ভাষা জানি তার ভিতর আমি চিরজীবন যে রসের সন্ধান করেছি, সে ইচ্ছে গীতিরস। শেলি কীট্‌স, গ্যোটে হাইনে, হাফিজ আত্তার, কালিদাস জয়দেব, গালীব জওক্ এঁদের গান বলুন কবিতা বলুন সবকিছুর রসাস্বাদ করে এ জীবন ধন্য মেনেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বার বার বলেছি—

'এমনটি আর পড়িল না চোখে,

আমার যেমন আছে!'

তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বার বার হার মেনেছি। রবীন্দ্রনাথের গান এমনি এক অখণ্ড রূপ নিয়ে হৃদয় মন অভিভূত করে ফেলে যে, তখন সর্ব-প্রকারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পায়।

জর্মনরা যখন 'লীডার' কিংবা ইরানিরা যখন গজল গান একমাত্র তখনই আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত জাতীয় কিঞ্চিৎ রস পেয়েছি। তাই একমাত্র সেগুলোর সঙ্গেই রীবন্দ্রনাথের গানের তুলনা করে ঈষৎ বিশ্লেষণ করা যায়।

তখন ধরা পড়ে :

রবীন্দ্রনাথের গানের অখণ্ড, সম্পূর্ণ রূপ। বহু লীডার এবং গজল শুনে মনে হয়েছে এ গান অপূর্ব, এ গান যদি আরো অনেকক্ষণ ধরে চলত তবে আরো ভালো লাগত অর্থাৎ শুধু যে অতৃপ্ত রেখে গিয়েছে তাই নয়, অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়েছে এ 'লীডার' বা 'গজল' আরো কিছুক্ষণ ধরে চলতে পারতো। রবীন্দ্রনাথের গান কখনই অসম্পূর্ণরূপে আমার সামনে দাঁড়ায়নি। তাঁর গান শুনে যদি কখনো মনে হয়ে থাকে এ গান আমাকে অতৃপ্ত রেখে গেল তবে তার কারণ তার অসম্পূর্ণতা নয়, তার কারণ অতিশয় উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি মাত্রই ব্যঞ্জনা এবং ধ্বনিপ্রধান। তার ধর্ম সম্পূর্ণ অতৃপ্ত করে ও ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি দিয়ে হৃদয়মন ভরে দেওয়া। তখন মনে হয়, এ গান আমার সামনে যে-ভুবন গড়ে দিয়ে গেল তার প্রথম পরিচয়ে তার সব কিছু আমার জানা হল না বটে, কিন্তু খেদ নেই, আবার শুনব তখন সে ভুবনের আরো অনেকখানি আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আর এমনি করে করে একদিন সে ভুবন আমার নিতান্ত আপন হয়ে উঠবে। কোন সন্দেহ নেই এরকম ধারাই হয়ে থাকে কিন্তু আরেকটি কথা তার চেয়েও সত্য : রবীন্দ্রনাথের কোন গানই কখনো নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে না।

শব্দের চয়ন, সে শব্দগুলো বিশেষ স্থলে সংস্থাপন এবং হৃদয়মনকে অভাবিত কল্পনাতীত নূতন শব্দের ভিতর দিয়ে উন্মুখ রেখে রেখে ভাবে, অর্থে, মাধুর্যের পরিসমাপ্তিতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গান যখন সাঙ্গ হয় তখন প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম করি, এ গান আর অন্য কোন রূপ নিতে পারতো না—নটরাজের মূর্তি দেখে যেমন মনে হয়, নটরাজ অন্য কোন অঙ্গভঙ্গি দিয়ে আমার চোখের সামনে নৃত্যকে রূপায়িত করতে পারতেন না। তাই বলি, নটরাজের প্রত্যেকটি অঙ্গ-ভঙ্গির মত রবীন্দ্রনাথের গানের প্রত্যেকটি শব্দ।

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, চমৎকার সুর তাল জ্ঞান, মধুরতম কণ্ঠ, তবু কোনো কোনো গায়কের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান ফিকে, পানসে অর্থাৎ ফ্লাট বলে মনে হয়। কেন এরকম ধারা হয় তার কারণ অনুসন্ধান করলে অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাবেন, গায়কের যথেষ্ট শব্দ-সম্মান বোধ নেই বলে প্রতিটি শব্দ রসিয়ে রসিয়ে গাইছেন না আর তাই যেন নটরাজের প্রতিটি অঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে গিয়ে তাঁর নৃত্য বন্ধ হয়ে গেল।

মৃত্তিকার বন্ধন থেকে রবীন্দ্রনাথ কত শতবার আমাদের নিয়ে গিয়েছেন 'নীলাম্বরের মর্মমাঝে।' আবার যখন তিনি আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তখন এই মৃত্তিকাই স্বর্গের চেয়ে অধিকতর 'মধুময় হয়ে ওঠে।'

'তারায় তারায় দীপ্তিশিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে—'

শুনে কি কল্পনা করতে পারি যে

'ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন,
হোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ।'

তারপর যখন মনকে তৈরি করলুম সেই স্বর্গসভার নব নব নব অভিজ্ঞতার জন্য তখন আবার হঠাৎ আমি

‘কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।।’

তারপর এ-ধারার কি অপরূপ বর্ণনা

‘হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন।’

কখনো স্বর্গে কখনো মর্ত্যে, আপন অজানাতে এই যে মধুর আনাগোনা, মানুষকে দেবতা বানিয়ে, আবার তাকে দেবতার চেয়ে মহত্ত্বর মানুষ করে তোলা—মাত্র কয়েকটি শব্দ আর একটুখানি সুর দিয়ে—এ অলৌকিক কর্ম যিনি করতে পারেন তিনিই ‘বিশ্বকর্মা মহাত্মা’।।

আড্ডা

আড্ডা সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকটি উত্তম উত্তম লেখা বাঙলায় বেরনোর পর ইংরিজিতেও দেখলুম আড্ডা হামলা চালিয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপের ভশচায এবং জমিদার-হাবেলির মৌলবী যেন হঠাৎ কোটপাতলুন-কামিজ পরে গট্‌গট করে স্টেটসম্যান অফিসে ঢুকলেন। আমার তাতে আনন্দই হল।

কিন্তু এসম্পর্কে একটি বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আড্ডাবাজরা বলতে চান, বাঙলার বাইরে নাকি আড্ডা নেই। কথাটা ঠিকও, ভুলও। তুলনা দিয়ে নিবেদন করছি। সিন্ধুনদ উজিয়ে যে মাছ ধরা পড়ে, তার নাম 'পাল্লা' — অতি উপাদেয় মৎস্য। নর্মদা উজিয়ে ভরোচ শহরে যে মাছ ধরা পড়ে তার নাম 'মদার' — সেও উপাদেয় মৎস্য। আর গঙ্গা পদ্মা উজিয়ে যে মাছ বাঙালীকে আকুল উতলা করে তোলে, তার নাম ইলিশ — খোট্টা (মাফ কী জীয়ে) মুল্লুকে পৌঁছনর পর তার নাম হয় হিল্‌সা।

উপর্যুক্ত সর্ব মৎস্য একই বস্তু — দেশভেদে ভিন্ন নাম। তফাৎ মাত্র এইটুকু যে সরষে বাটা আর ফালি ফালি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমরা যে রকম ইলিশদেবীর পূজো দি বাদবাকীরা ওরকমধারা পারে না। অর্থাৎ আড্ডা বহু দেশেই আছে, শুধু আমাদের মত তরিবৎ করে রসিয়ে রসিয়ে চাখতে তারা জানে না। অপিচ ভুললে চলবে না সিন্ধীরা আমাদের সরষে-ইলিশ খেয়ে নাক সিঁটকে বলেন, কী উম্‌দা চীজকে বরবাদ করে দিলে।' ভৃগুকচ্ছের (ভরোচের) মহাজনগণও সিন্ধীর রান্না পাল্লা খেয়ে 'আল্লা আল্লা' বলে রোদন করেন।

কে সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ বিচার করবে? এ যে রসবস্তু — এবং আমার মতে ভোজনরস সর্বরসের রসরাজ।

তাই কাইরোর আড্ডাবাজরা বলেন, একমাত্র তাঁরাই নাকি আড্ডা দিতে জানেন।

কাইরোর আড্ডা কক্‌খনো কোন অবস্থাতেই কারো বাড়িতে বসে না। আড্ডাবাজরা বলেন, তাতে করে আড্ডার নিরপেক্ষতা—কিংবা বলুন গণতন্ত্র—লোপ পায়। কারণ যাঁর বাড়িতে আড্ডা বসলো, তিনি পানটা-আসটা, খিচুড়িটা, ইলিশ-ভাজাটা (আবার ইলিশ! সুশীল পাঠক, ক্ষমা করো। ঐ বস্তুটির প্রতি আমার মারাত্মক দুর্বলতা আছে। বেহেশ্‌তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বকৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার কণামাত্র বাসনা আমার নেই) ফিরি' দেন বলে তাঁকে সবাই যেন একটু বড্ড বেশি তোয়াজ করে। আড্ডাগোত্রের মিশরী নিকষ্যি মহাশয়রা বলেন, বাড়ির আড্ডায় 'মেল' মেলে না।

অপিচ, পশ্য পশ্য, কোনো কাফেতে যদি আড্ডা বসে, তবে সেখানে কেউ কাউকে খয়ের খাঁ বানাতে পারে না — যেন পুরীর মন্দির, জাতফাত নেই, সব ভাই, সব বেরাদর।

এবং সবচেয়ে বড় কথা বাড়ির গিন্নী 'মুখপোড়া মিনষেরা ওঠে না কেন' কখনো শুনিয়ে, কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে অকারণে অকালে আড্ডার গলায় ছুরি চালাতে পারেন না। তার চেয়ে দেখো দিকিনি, দিব্যি কাফেতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছ, পছন্দমাফিক মমলেট, কটলেট খাচ্ছো, আড্ডা জমজমাট ভরভরাট, কেউ বাড়ি যাবার নামটি করছে না, কারো গিন্নী এসে উপস্থিত হবেন সে ভয়ও নেই — আর চাই কি?

শতকরা নব্বুইজন কাইরোবাসী আড্ডাবাজ এবং তার দশ আনা পরিমাণ অর্ধেক জীবন কাটায় কাফেতে বসে আড্ডা মেরে। আমাদের আড্ডা বসত 'কাফে দ্য নীল' বা 'নীলনদ কাফেতে'। কফির দাম ছ'পয়সা, ফি পাত্তর। রাবড়ির মত ঘন, কিন্তু দুধ চাইলেই চিত্তির। সবাই কালো কফি খায়, তাই দুধের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না, দু'দিনেই অভ্যাস হয়ে যায়। কালো কফি খেলে রঙভী ফর্সা হয়।

আমাদের আড্ডাটা বসত কাফের উত্তর-পূর্ব কোণে, কাউন্টারের গা ঘেঁষে। হরেক জাতের চিড়িয়া সে আড্ডায় হরবকৎ মৌজুদ থাকত। রমজান বে আর সজ্জাদ এফেন্দি খাঁটি মিশরী মুসলমান, ওয়াহহাব আতিয়া কপ্ট ক্রীশ্চান অর্থাৎ ততোধিক খাঁটি মিশরী, কারণ তার শরীরে রয়েছে ফারাওদের রক্ত। জুর্নো ফরাসী কিন্তু 'ক' পুরুষ ধরে 'কাইরোর হাওয়া বিষাক্ত করছে, কেউ জানে না , অতি উত্তম আরবী কবিতা লেখে আর সে কবিতার আসল বক্তব্য হচ্ছে, সে তলওয়ার চালিয়ে আড়াই ডজন বেদুইনকে ঘায়েল করে প্রিয়াকে উটের উপর তুলে মরুভূমির দিগ্‌দিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যদিও আমরা সবাই জানতুম, জুর্নে যেটুকু মরুভূমি দেখেছে সে পিরামিডে বেরাতে গিয়ে, তাও জীবনে একবার মাত্র, যদিও পিরামিড কাইরো থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। উট কখনো চড়েনি, ট্রামের ঝাঁকুনিতেই বমি করে ফেলে। আর তলওয়ার? তওবা, তওবা! মার্কোস জাতে গ্রীক, বেশি নয় কুল্লে আড়াই হাজার বৎসর ধরে, তারা মিশরে আছে। মিশর রাণী, গ্রীক রমণী ক্লিয়োপাত্রার সঙ্গে তার নাকি খোশকুটুম্বিতা আছে। হবেও বা, কারণ প্রায়ই ব্যবসাতে দাঁও মেরেছে বলে ফালতো এবং 'ফিরি' এক রোঁদ কফি খাইয়ে দিত। তাতে করে কাফের 'গণতন্ত্র' ক্ষুণ্ণ হত না, কারণ মার্কোসকে 'কাট্যা ফালাইলে'ও আড্ডার ঝগড়া-কাজিয়ায় সে কস্মিনকালেও হিস্যা নিত না; বেশিরভাগ সময় চেয়ারের হেলানে মাথা রেখে আকাশের দিকে হাঁ করে ঘুমুতো কিংবা খবরের কাগজ থেকে তুলোর ফটকা বাজারের তেজি-মন্দির। (বুল-অ্যান্ড বিয়ার) হালহকিকৎ মুখস্থ করতো।

আর বাঙলা দেশের তাবৎ চণ্ডীমণ্ডপ, বেবাক জমিদার-হাবেলীর আড্ডার প্রতিভূ হিসেবে আপনাদের আশীর্বাদে আর শ্রীগুরুর কৃপায় ধূলির ধূলি এ-অধম।

আমার বাড়ির নিতান্ত গা ঘেঁষে বলে নিছক কফি পানার্থে ঐ কাফেতে আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যা যেতুম। বিদেশ বিভুঁই, কাউকে বড় একটা চিনিনে, ছন্নের মত হেথা-হোথা ঘুরে বেড়াই আর দেশ ভ্রমণ যে কি রকম পীড়াদায়ক 'প্রতিষ্ঠান' সে সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক কেতাব লিখব বলে মনে মনে পাঁয়তারা কষি। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল গেল কাফের কোণের আড্ডাটির দিকে। লক্ষ্য করিনি যে কফি-পানটা ওদের নিতান্ত গৌণকর্ম ওরা আসলে আড্ডাবাজ।

আম্মো যে আড্ডাবাজ সে তত্ত্বটা ওদের মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই ব্রাহ্ম মুহূর্তে। সে 'মহালগনের

বর্ণনা' আমি আর কি দেব? সুরসিক পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো শ্রীহরি শ্রীরাধাতে, ইউসুফ জোলেখাতে, লায়লী মজনুতে, ত্রিস্তান ইজোল্‌দেতে কি করে প্রথম চারি চক্ষু বিনিময় হয়েছিল। কী ব্যাকুলতা, কী গভীর তৃষা, কী মহা ভবিষ্যতের প্রগাঢ় সুখস্বপ্ন, কী মরুতীর পার হয়ে সুধাশ্যামলিম নীলাম্বুজে আবগাহনানন্দ সে দৃষ্টি বিনিময়ে ছিল! এক ফরাসী কবি বলেছেন, 'প্রেমের সবচেয়ে মহান দিবস সেদিন, যেদিন প্রথম বলেছিলুম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম হল সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে।

তাবা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে আসুন, স্পর্শ করে বলব, তিন লহমাও লাগেনি, এই ব্রাত্যের উপনয়ন হয়ে গেল, বেদ, শাখা ঋষি স্থির হয়ে গেলেন — সোজা বাঙলায় বলে, জাতে উঠে গেলুম। অমিয়া ছানিয়া, নয়ন হানিয়া বললুম, 'এক রোঁদ কফি?'

আড্ডার মেম্বররা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরিতোষের স্মিতহাস্য বিকশিত করলেন। ভাবখানা ভুল লোককে বাছা হয়নি।

কাফের ছোকরাটা পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। আমার ছন্নছাড়া ভাবটা তার চোখে বহু পূর্বেই ধরা পড়েছিল। রোঁদ পরিবেশন করার সময় নীলনদ-ডেল্টার মত মুখ হাঁ করে হেসে আমি যে অতিশয় ভদ্রলোক—অর্থাৎ জোর টিপ্‌স দি — সেকথাটা বলে আড্ডার সামনে আমার কেস রেকমেন্ড করলো।

জুর্নো তাড়া লাগিয়ে বললেন, 'যা, যা, ছোঁড়া মেলা জ্যাঠামো করিসনে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাস আরবী বলেন আপনি।'

রবিঠাকুর বলেছেন —

'এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া

সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া

বিদেশীর অঙ্গ হতে —'

ঠিক সেই ধরনে আমার দিকে তাকিয়ে জুর্নো যেন আমার প্রবাস-লাঞ্ছনা এক থাবড়ায় ঝেড়ে ফেললেন, আমার অঙ্গ থেকে।

আমি কিন্তু মনে মনে বললুম, 'ইয়া আল্লা, তের দিনের আরবীকে যদি এরা বলে খাসা তবে এরা নিশ্চয়ই খানদানী মনিষ্যি।' করজোড়ে বললুম, 'ভারতবর্ষের নীতি সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অপ্রিয়সত্য বলবে না; আপনাদের নীতি দেখছি আরো এক কদম এগিয়ে গিয়েছে, প্রিয় অসত্যও বলবে।'

আড্ডা তো — পার্লিমেন্ট নয় — তাই হরবকৎ কথার পিঠে কথা চলবে এমন কোনো কসমদিব্যি নেই। দুম্‌ করে রমজান রে বললে, 'আমার মামা (আমি মনে মনে বললুম, 'যগ্যিদাসের মামা') হজ করতে গিয়েছিলেন আর বছর। সেখানে জনকয়েক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারা নাকি পাঁচ বকৎ নামাজ পড়ত আর বাদবাকি তামাম দিনরাত এক চায়ের দোকানে বসে কিচিরমিচির করত। তবে তারা নাকি কোন্‌ এক প্রদেশের — বিঙ্গালা, বাঙীলা —কি যেন—আমার ঠিক মনে নেই—'

উৎসাহে উত্তেজনায় ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে আমি শুধালাম 'বাঙালা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলুম, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম বাঙালী। কিন্তু কই, কখনো তো এত গর্ব অনুভব করিনি যে, আমি বাঙালী। এই যে নমস্য মহাজনরা মক্কা শহরে আড্ডাবাজ হিসেবে নাম করতে পেরেছেন — নিশ্চয়ই বিস্তর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাঁরা আলবৎ শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, চাঁটগা, কাছাড়ের বাঙালী খালাসী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে খিদিরপুরে আড্ডা মারতে শিখে 'হেলায় মক্কা করিলা জয়'।

আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে ডান হাত বুকের উপর রেখে মাথা নিচু করে অতিশয় সবিনয় কণ্ঠে বললুম, 'আমি বাঙালী।'

গ্রীক সদস্য মার্কোস প্রথম পরিচয়ের সময় একবার মাত্র 'সালাম আলাইক্' করে খবরের কাগজের পিছনে ডুব মেরেছিলেন। তাঁর কানে কিছু যাচ্ছিল কি না জানিনে। আমি ভাবলুম, রাশভারী লোক, হয়ত ভাবছেন, নূতন মেম্বার হলেই তাকে নূতন জামাইয়ের মত কাঁধে তুলে ধেই ধেই করেই নাচতে হবে একথা আড্ডার কন্স্টিট্যুশানে লেখে না। মুখের উপর থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'দাঁও মেরেছি। একটা শ্যাম্পেন হবে? আমাদের নূতন মেম্বর—।' কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল মালিক; তার দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত গোল করে বোতল ধরার মুদ্রা দেখিয়ে ডান হাত দিয়ে দেখালেন ফোয়ারার জল লাফনোর মুদ্রা। ম্যানেজার কুল্লে দুই ডিগ্রী কাৎ করে ঘাড় নাড়ল।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'এ দোকানে তো মদ বেচার লাইসেন্স নেই।'

মার্কোস বললেন, 'কাফের পিছনে, তার ড্রইংরুমে। ব্যাটা সব বেচে — আফিম, ককেইন, হেরোইন, হশীশ যা চাও।'

ছোকরাকে বললেন, 'আর একটা তামাকও সাজিস।'

বলে কি? কাইরোতে তামাক! স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু?

দিব্যি ফর্শী হুঁকো এল। তবে হনুমানের ন্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয় আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা জরির কাজ করা আমাদের ফর্শী কেমন যেন একটু 'নাজুক' মোলায়েম হয়— এদের যেন একটু গাঁইয়া। তবে হ্যাঁ, চিলিমটা দেখে ভক্তি হল — ইয়া ডাবর পরিমাণ। একপো তামাক হেসেখেলে তার ভিতর থানা গাড়তে পারে—তাওয়াও আছে। আগুনের বেলা অবিশ্যি আমি টিকের ধিকিধিকি গোলাপী গরম প্রত্যাশা করিনি, কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকে বানাবার গুহ্যতথ্য সেখানকার রসিকরাও জানেন না।

আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চোদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।

পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভুবনবিখ্যাত। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তরিবৎ করে বানাতে শিখল কি করে? আইস, সে সম্বন্ধে ঈষৎ গবেষণা করা যাক্! এক সিগারেট বানানোর পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এন্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়নশাস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে।

সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোট অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে। ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া খায়, কিছুটা গ্রীক কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ন নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর আধিপত্য করতো তুর্কী এবং তুর্কী গ্রীসের বেবাক তামাক ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে কাগজে পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কব্জাতে, তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মাখিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনলী নির্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ন সিগারেট।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন চায়ের টিন যদি রান্না ঘরে ভালো করে বন্ধ না রাখা হয়, তবে ফোঁড়নের ঝাঁকে চা বরবাদ হয়ে যায়, অর্থাৎ আর কিছু না হোক খুশবাইটি আঁতুড়ঘরে নুন-খাওয়ানো বাচ্চার মত প্রাণত্যাগ করে। মালজাহাজ লাদাই করা যে অপিসারের কর্ম তিনিও বিলক্ষণ জানেন, যে -জাহাজে কাঁচা তামাক লাদাই করা হয়েছে তাতে করে গন্ধওলা অন্য কোনো মাল নেওয়া হয় না—পাছে, তামাকের গন্ধ এবং কিঞ্চিৎ স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়।

তাই তামাকের স্বাদ নষ্ট না করে সিগারেটকে খুশবাইয়ে মজানো অতীব কঠিন কর্ম। সিগারেটে একফোঁটা ইউকেলিপ্টস্ তেল ঢেলে সেই সিগারেট ফুঁকে দেখুন একফোঁটা তেল আস্ত সিগারেট একদম বরবাদ করে দিয়েছে। পাঁচ বছরের বাচ্চাও তখন সে সিগারেট না কেশে অনায়াসে ভস্ ভস্ করে ফুঁকে যেতে পারে (বস্তুত বড্ড বেশি ভেজা সর্দি হলে অনেকে এই পদ্ধতিতে ইউকেলিপ্টস্ সেবন করে থাকেন—যাঁরা সিগারেট সইতে পারেন না তাঁরা পর্যন্ত)।

বরঞ্চ এমন গুণী আছেন যিনি এটম বমের মাল-মশলা মেশানোর হাড়হদ্দ হালহকিকৎ জানেন, কিন্তু তামাকের সঙ্গে খুশবাই! তার পিছনে রয়েছে গূঢ়তর, রহস্যাবৃত ইন্দ্রজাল।

কিচ্ছু বাড়িয়ে বলছিনে। অজন্তার দেওয়াল এবং ছবির রঙ কোন্ কোন্ মশলা দিয়ে বানানো হয়েছিল, পাঠানযুগে পাথরে পাথরে জোড়া দেবার জন্য কি মাল কোন পরিমাণে লাগানো হয়েছিল আমরা সে তত্ত্বগুলো মাথা খুঁড়েও বের করতে পারিনি এবং পারেনি বিশ্বসংসার বের করতে কি কৌশলে, কি মশলা দিয়ে মিশরীরা তাদের মমীগুলোকে পচার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

স্বীকার করি, মিশরীরাই একদিন সে কায়দা ভুলে মেরে দিয়েছিল — পাঠান-মোগলযুগে যে রকম আমাদের অনেকখানি রসায়নবিদ্যা অনাদরে লোপ পায়। তবু তো আমরা আজও মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ বানাতে পারি — ভেজাল তো শুরু হল মাত্র সেদিন, আমাদেরই চশমার সামনে।

মিশরীরাও ঠিক সেই রকম সুগন্ধ-তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুলে যায়নি। ঝড়তি-পড়তি যেটুকু এলেম তখনো তাদের পেটে ছিল তাই দিয়ে তারা সেই সমস্যা সমাধান করলো, তামাকে কি করে খুশবাই জোড়া যায়, তামাকের 'সোয়াদ'টি জখম না করে!

তাই যখন কোনো ডাকসাঁইটে তামাক কদরদারের (হায়! এ গোত্র পৃথিবীর সর্বত্র কি কাবুল, কি দিল্লী, কি কাইরো — সুকুমারের ভাষায় বলি—হুশ হুশ করে মরে যাচ্ছে) তদারকিতে কাইরোর কাফেতে

তামাক সাজা হয় এবং সেই কদরদার যখন সে তামাকের নীলাভ ধুয়োটি ফুরফুর করে নাকের ভিতর দিয়ে ছাড়েন এবং নীলনদের মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া যখন সেই ধুঁয়োটির সঙ্গে রসকেলি করে তাকে ছিন্নভিন্ন করে কাফের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, তখন রাস্তার লোক পর্যন্ত উন্নাসিক হয়ে থমকে দাঁড়ায়, পাঁড় সিগারখেকো, পাইকারি সিগারেট ফোঁকো পর্যন্ত বুকের উপর হাত রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে 'অলহমদুলিল্লা, অলহমদুলিল্লা' (খুদাতালাব তারিফ) বলে।

আর ইলিশের বেলা যে রকম হয়েছিল, এ অধম ঠিক সেই রকম তাজ্জব মানে, বেহশতের বর্ণনায় এ তামাকের বয়ান নেই কেন? তা হলে পাপ করে নরকে যেত কোন মূর্খ?

বাঙালী তার চুলটিকে কেতাদুরস্ত করে রাখতে ভালবাসে, কাবুলী বেলা-অবেলা মোকা পেলেই তার পায়জারে গুটিকয়েক পেরেক ঠুকিয়ে নেয়, ইংরেজ আয়না সামনে পেলেই টাইটা ঠিক মধ্যিখানে আছে কিনা, তার তদারকিতে করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পেশওয়ারী পাঠানের প্রধান শিরঃপীড়া তার শিরাভরণ নিয়ে, আর মিশরীর চরম দুর্বলতা তার জুতো জোড়াটিকে 'বালিশ' (আরবী ভাষায় 'প' অক্ষর নেই, তাই, ইংরিজি 'পালিশ' কথাটা মিশরীতে 'বালিশ' রূপ ধারণ করেছে) রাখার জন্য।

অতএব কাফেতে ঢোকামাত্রই কাফের 'বুৎ-পালিশ' (অর্থাৎ বুট পালিশ করনেওলা) ছোকরা এসে আপনাকে সেলাম ঠুকবে। আপনি তাকে বিলক্ষণ চেনেন, তাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলবেন, 'যা, যা'—তার অর্থ 'আচ্ছা পালিশ কর।' সে বত্রিশখানা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে আপনার 'বুৎ-বালিশ' কর্মে নিযুক্ত হবে।

সদস্যদের কেউ বলবেন, 'শুভ দিবস', কেউ 'এই যে', কেউ একটু মৃদু হাস্য করবেন, আর কেউ মুখ খবরের কাগজের আড়ালে রেখেই কাগজখানা ঈষৎ দুলিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে আপনার কফি এসে উপস্থিত। ওয়েটার ঠিক জানে, আপনি কতটা কড়া, কতখানি চিনি আর কোন ঢঙের পেয়ালার কফি খেতে পছন্দ করেন। আপনি বলবেন, 'চিঠিপত্র নেই?'

অর্থাৎ গৃহিণীর ভয়ে আপনি প্রিয়াকে কাফের ঠিকানা দিয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফোন?'

'আজ্ঞে না। তবে ইউসুফ বে আপনাকে বলতে বলেছেন, তিনি একটু দেরিতে আসবেন। আপনি যেন চলে না যান।'

'চুলোয় যাক গে ইউসুফ বে। আমি জিজ্ঞেস করছি, চিঠি বা ফোন নেই?'

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'আজ্ঞে না।' জানে আজ আপনি দরাজ হাতে বখশিশ দেবেন না।

'যাও, চিঠির কাগজ নিয়ে এস।'

কাফের নাম-ঠিকানা লেখা উত্তম চিঠির কাগজ, খাম ব্লটিং প্যাড যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এক মিনিটের ভিতর উপস্থিত হবে। আপনি পাশের টেবিলে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রেমপত্র লিখে যখন ঘণ্টাখানেক পরে আড্ডার টেবিলে ফিরে ওয়েটারকে বলবেন, চিঠিটা ডাকে ফেলতে, তখন হঠাৎ রমজান বে শুধাবে, 'কাকে লিখলে?' যেন কিছুই জানে না।

চটে গিয়ে বলবেন, 'তোমার তাতে কি?'

রমজান বে উদাস সুরে বলবে, 'না, আমার তাতে কি। তবু বলছিলুম, সকালে বিল্‌কিসের সঙ্গে দেখা। সে তোমাকে বলে দিতে বললে, তুমি যেন সাড়ে এগারোটায় 'ফামিনা' সিনেমার গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা করো।'

আরো চটে গিয়ে বলবেন, 'তাহলে এতক্ষণ ধরে সেটা বলোনি কেন?'

'সাড়ে এগারোটা বাজতে তো এখনো অনেক দেরি।'

'আঃ, সে কথা হচ্ছে না। আমি যে মিছিমিছি এক ঘণ্টা ধরে চিঠিটা লিখলুম।'

রমজান বে আরো উদাস সুরে বলবে, 'জানিনে ভাই, তোমাদের দেশে প্রেমের রেওয়াজ কি। এদেশে তো জানি, প্রিয়া পাশের ঘরে, আর এ-ঘরে বসে প্রেমিক পাতার পর পাতা প্রেমপত্র লিখে যাচ্ছেন।'

এতক্ষণ একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থিত হল। রেশনশপ খোলা মাত্রই মেয়ে-মদ্দে যে রকম দোকানের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তামাম আড্ডা ঠিক সেই রকম প্রেমপত্র লেখার সময়-অসময়, মোকা-বে-মোকা, কায়দা-কেতা সম্বন্ধে আলোচনা জুড়ে দেবে।

ক্রমে ক্রমে আলোচনার বিষয়বস্তু হটতে হটতে পৌঁছবে সেই সনাতন প্রশ্নে, কোন্ দেশের রমণী সবচেয়ে সুন্দরী হয়।

অবান্তর নয়, তাই নিবেদন করি, দেশ-বিদেশ ঘুরেছি, অর্থাৎ ভ্যাগাবন্ড হিসাবে আমার ঈষৎ বদনাম আছে। কাজেই আমাকে কেউ শুধান, কোন্ দেশের রান্না সবচেয়ে ভাল কেউ শুধান, তুলনাত্মক কাব্যচর্চার জন্য কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশস্ততম, আর অধিকাংশ শুধান, কোন দেশের রমণী সবচেয়ে সুন্দরী?

আমি কলির পরশুরামের স্মরণে উত্তর দি, 'এনারা আছেন, ওনারাও আছেন।' কারণ যাঁরা দেশ বিদেশ ঘোরেননি, তাঁদের সঙ্গে এ-আলোচনাটা দানা বাঁধে না বড্ড একতরফা বক্তৃতার মত হয়ে যায়, আর সবাই জানেন বক্তৃতা আড্ডার সবচেয়ে ডাঙর দুশমন।

এ সংসারে যদি কোন শহরের সত্যকার হক্ক থাকে, উপযুক্ত প্রাণাভিরাম বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তবে কসম খেয়ে বলতে পারি, সে শহর কাইরো। কারণ কাইরোতে খাঁটি বাসিন্দারূপে যুগ যুগ ধরে আছে গ্রীক, আরব, তুর্কী, হাবশী, সুদানী, ইতালীয়, ফরাসীস্ ইহুদী এবং আরো বিস্তর চিড়িয়া। এদের কেউ কেউ বোরকা পরেন বটে, তবু অক্লেশে বলা যেতে পারে, কাফের দরজার দিকে মুখ করে বসে, আড্ডা অনায়াসে নিজের মুখে ঝাল খেয়ে নিতে পারে।

আর শীতকাল হলে তো পোয়া বারো। কাইরোতে বছরে আড়াই ফোঁটা বৃষ্টি হয়, সাহারার শুকনো হাওয়া যক্ষ্মারোগ সারিয়ে দেয়, পিরামিড-কাইরোর বাইরেই ঠায় বসে, ফুর্তি ফার্তির নামে কাইরো বে-এক্তিয়ার, মসজিদ-কবর কাইরো শহরে বে-শুমার, শীতকালে না-গরম-না-ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে কাইরো ট্যুরিস্টজমের ভূস্বর্গ এবং ট্যুরিস্টাদেরও বটে।

তদুপরি মার্কিন লক্ষপতিরা আসেন নানা ধান্দায়। তাঁদের সন্ধানে আসেন তাবৎ দুনিয়ার ডাকসাঁইটে সুন্দরীরা। তাঁদের সন্ধানে আসেন হলিউডের ডিরেক্টররা এবং তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন আরেক ঝাঁক সুন্দরী।

কিন্তু থাক্, সুশীল পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো, কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে আলোচনা শাস্ত্রে নিষেধ। গুরুর বারণ।

* * *

মিশরী আড্ডাবাজরা (দাঁড়ান, ব্যাকরণে ভুল হয়ে গেল, মিশরী মাত্রই আড্ডাবাজ : এমনকি সাদ্ জগলুল পাশা পর্যন্ত দিনে অন্তত একবার আড্ডার সন্ধানে বেরতেন। তবে হ্যাঁ, তিনি কোনো টেবিলে গিয়ে বসলে কেউ সাহস করে সে টেবিলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না। সেখান থেকে তিনি চোখের ঈশারায় এঁকে ওঁকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আড্ডা জমাতেন) দৈবাৎ একই আড্ডায় জীবন কাটান। বিষয়টা সবিস্তর বুঝিয়ে বলতে হয়।

এই মনে করুন, আপনি রোজ আপিস ফেরার পথে 'কাফে দ্য নীলের, উত্তর-পূর্ব কোণে বসেন। সে টেবিলটায় আপনার জন-পাঁচেক দোস্ত বসেন। আড্ডার ফুল স্ট্রেন্থ্ জন দশ — সবাই কিন্তু সব দিন এ আড্ডাতেই আসেন না। তাই হরে দরে আপনার টেবিলে জন পাঁচ-সাত নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

এ ছাড়া আপনি সপ্তাহে একদিন — জোর দু'দিন, বাড়ির পাশের সেমিরামিস কাফেতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসেন। এ আড্ডার সদস্যরা কিন্তু আপনার 'কাফে দ্য নীলের' সদস্যদের বিলকুল চেনেন না। এরা হয়ত চ্যাংরার দল, কলেজে পড়ে, কেরানীগিরি করে, বেকার, কিংবা ইনশিওরেন্স এজেন্ট (তার অর্থও বেকার)। এদের আলোচনার বিষয়বস্তু রাজনীতি, অর্থাৎ কোন্ পাশার বউ কোন মিনিস্টারের সঙ্গে পরকীয় করেন বলে তাঁর বোনপো পার্টিতে ভালো নোকরি পেয়ে গেল কিংবা আলোচনার বিষয়বস্তু সাহিত্য, অর্থাৎ কোন প্রকাশক এক হাজারের নাম করে তিন হাজার ছাপিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া অবশ্যই দুনিয়ার হাজারো জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়, তা না হলে আড্ডা হবে কেন। এ আড্ডার সদস্যদের সবাই সবজান্তা। এরা মিশর তথা তাবৎ দুনিয়ার এত সব গুহ্য এবং গরম গরম খবর রাখেন যে এদের কথাবার্তা, হাবভাব দেখে আপনার মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না যে এদের প্রত্যেকের চোখের সামনে এক অদৃশ্য, অশ্রুত টেলিপ্রিন্টার খবর জানিয়ে যাচ্ছে এবং সে খবরের যোগান দিচ্ছেন রাশার বেরিয়া, জর্মানির হিমলার আর কলকাতার টেগার্ট। রোজ বাড়ি ফেরার সময় আপনি তাজ্জব মানবেন, এদের সাহায্য ছাড়া মিশর তথা দুনিয়ার বাদবাকি সরকারগুলো চলছে কি করে। আপনার মনে আর কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না যে, এদের যদি মস্কো, বার্লিন, লন্ডন, দিল্লীর বড়কর্তা বানিয়ে দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ার কুল্লে সমস্যার সাকুল্যে সমাধান এক লহমায়ই হয়ে যাবে। মনে মনে বললেন, 'হায় দুনিয়া, তুমি জানছো না তুমি কি হারাচ্ছো।'

আপনি এদের চেয়ে বছর দশেক বড়, তাই এরা আপনাকে একটুখানি সমীহ করে যদিও আড় না হয়েই বিড়ি টানে কারণ এদেশে সে রেওয়াজটা তেমন নেই। আপনি নিতান্ত বিদেশী বলেই এ আড্ডায় ছিটকে এসে পড়েছেন। এদের কাউকে পয়লা আড্ডায় নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি নিয়ে গিয়েছিলুম; বেচারী সেখানে রা'টি কাড়ে নি যদ্যপি দুসরা আড্ডাতে সেই তড়পাতো সবচেয়ে বেশ।

তা ছাড়া আপনি মাসে একদিন কিংবা দু'দিন শহর থেকে মাইল তিনেক দুরে একটা কাফেতে যান। আপনার এক বন্ধু সে কাফেটারই উপরতলায় থাকেন। খাসা জায়গায়—সামনেই নীলনদ বয়ে যাচ্ছে। আপনারই বন্ধু এখানকার এ-আড্ডার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে প্রথম খুঁজবেন কাফেতে — সেখানে না পেলে অবশ্য তাঁর ফ্ল্যাটে যেতে পারেন তাতে কিন্তু কোনো লাভ নেই।

এ কাফে আপনাকে উদ্বাহু হয়ে অভ্যর্থনা করবে যেন আপনি অনেক দিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরে-পাওয়া ভাই। কারণ আপনি এখানে আসেন কালেভদ্রে। আপনাকে পেয়ে এঁদের বিশেষ আনন্দ কারণ পক্ষাধিক কাল ধরে তাঁরা যে সব বিষয় কেটেকুটে ঘষেপিষে চাটনি বানিয়ে ফেলেছিলেন সেগুলো তাঁরা নূতন করে হাড়কাটে ঢুকিয়ে রাম দা' ওঁচাবেন। আপনার রায় জানতে চাইবেন। যে রায়ই দিন না কেন আপনার উদ্ধার নেই। আপনি যদিও গাঁধার দেশের লোক—আপনি অবশ্য একশ' বার ওঁদের বলেছেন যে গাঁধীর সঙ্গে আপনার কোনো প্রকারে সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, কিন্তু তাতে করে কোনো ফায়দা ওৎরায় না—যদিও আপনার জ্ঞানগম্যিতে কারো কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আপনি গুহ্য ষষ্ঠেন্দ্রিয় ধারণ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তবু স্বীকার করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি নির্ঘাত শেষ বাস মিস করবেন। বন্ধুর ফ্ল্যাটে সোফার উপর চতুর্থ যাম যাপন করে পরদিন সকালবেলা বাড়ি ফিরবেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪ - ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) ছিলেন একজন প্রখ্যাত বাঙালি লেখক, সাংবাদিক, ভ্রামণিক, আকাদেমিক, পণ্ডিত ও বহুভাষী। সৈয়দ মুজতবা আলী ব্রিটিশ ভারতে আসামের অন্তর্ভুক্ত সিলেটের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পড়াশোনা ও চাকরিসূত্রে বাংলাদেশ, ভারত, জার্মানি, আফগানিস্তান ও মিশরে বসবাস করেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, অনুবাদক ও রম্যরচয়িতা সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ভ্রমণকাহিনীর জন্য বিশেষভাবে জনপ্রিয়। তাঁর রচনা একই সঙ্গে পাণ্ডিত্য এবং রম্যবোধে পরিপুষ্ট। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় সেখানের বিশ্বভারতী নামের হস্তলিখিত ম্যাগাজিনে মুজতবা আলী লিখতেন। পরবর্তীতে তিনি 'সত্যপীর', 'ওমর খৈয়াম', 'টেকচাঁদ', 'প্রিয়দর্শী' প্রভৃতি ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায়, যেমন : দেশ, আনন্দবাজার, বসুমতী, সত্যযুগ, মোহাম্মদী প্রভৃতিতে কলাম লিখেন। তার বহু দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন ভ্রমণলিপি। এছাড়াও লিখেছেন ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা। বিবিধ ভাষা থেকে শ্লোক ও রূপকের যথার্থ ব্যবহার, হাস্যরস সৃষ্টিতে পারদর্শিতা এবং এর মধ্য দিয়ে গভীর জীবনবোধ ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। অনেকের মতে, ১৯৫০-৬০ দশকে মুজতবা আলী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক।

বাংলা - ক পাঠক্রমের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি

গল্প

১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.....	অতিথি, ছুটি, পোস্টমাস্টার
২.	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	.....	পুঁই মাচা
৩.	প্রেমেন্দ্র মিত্র	.....	তেলেনাপোতা আবিষ্কার
৪.	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	.....	কে বাঁচায়, কে বাঁচে, হলুদ পোড়া
৫.	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	.....	স্বাধীনতা
৬.	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	.....	আদরিনী
৭.	আশাপূর্ণা দেবী	.....	ত্রাণকর্তা
৮.	পরশুরাম	.....	পরশপাথর
৯.	সতীনাথ ভাদুড়ী	.....	ডাকাতের মা
১০.	বনফুল	.....	বন্য মহিষ
১১.	মহাশ্বেতা দেবী	.....	ভাত, রং নাম্বার
১২.	সমরেশ বসু	.....	পশারিণী
১৩.	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	.....	ভারতবর্ষ
১৪.	মতি নন্দী	.....	অস্থায়ী পলায়ন
১৫.	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	.....	লেখিকা
১৬.	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	.....	শাজাহান আর তার নিজস্ব বাহিনী
১৭.	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	.....	সম্পূর্ণতা

প্রবন্ধ

১.	হুতোম প্যাঁচা	.....	ভূত নাবানো
২.	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	.....	কমলাকান্তের জোবানবন্দী

৩.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.....	কৌতুকহাস্য, নবযুগ, বিদ্যার যাচাই, সভ্যতার সংকট
৪.	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	.....	জগতের শ্রেষ্ঠ বই
৫.	আব্দুল জব্বার	.....	ধানের নাম লক্ষ্মী
৬.	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	.....	গালিলিও
৭.	অশীন দাশগুপ্ত	.....	রবি ঠাকুরের দল/সহিষ্ণুতার ইতিহাস
৮.	সৈয়দ মুজতবা আলি	.....	নেতাজী
৯.	কল্যাণী দত্ত	.....	আম
১০.	কাজী নজরুল ইসলাম	.....	ক্ষুদিরামের মা
১১.	নবনীতা দেবসেন	.....	দামাস্কাসের গেট (অংশ)
১২.	স্বামী বিবেকানন্দ	.....	সুয়েজখালে : হাঙ্গর শিকার, বাঙ্গালা ভাষা
১৩.	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.....	ঘরোয়া (অংশ)
১৪.	প্রমথ চৌধুরী	.....	সুরের কথা
১৫.	বিনয় ঘোষ	.....	হাসি
১৬.	শান্তিদেব ঘোষ	.....	বাংলাদেশের যাত্রাভিনয়

ভারতীয় গল্প

১.	শঙ্কর রাও খারাট	.....	পোটরাজ
২.	কর্তার সিংহ দুগ্‌গাল	.....	অলৌকিক

আন্তর্জাতিক গল্প

১.	গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ	.....	বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো
২.	আন্তন চেকভ	.....	কেরানির মৃত্যু

কবিতা

১.	বিদ্যাপতি	.....	বিরহে তন্ময়তা
২.	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	.....	বীরাঙ্গনা, সনেট (বটবৃক্ষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

৩.	লালন ফকির	.....	বাড়ির কাছে আরশিনগর, লালন গীতিকা
৪.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.....	রুপনারানের কূলে/আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে/ প্রাণ/ ঝড়ের খেয়া/ আধোজাগা / প্রার্থনা
৫.	কাজী নজরুল ইসলাম	.....	বিদ্রোহীর বাণী, অরুনকান্তি কে গো, দ্বীপান্তরের বন্দিনী, সাম্যবাদী
৬.	জীবনানন্দ দাশ	.....	শিকার, তিমির হননের গান, আলোপৃথিবী
৭.	অমিয় চক্রবর্তী	.....	বিনিময়
৮.	বিষ্ণু দে	.....	স্বহস্তে বাজাবে
৯.	বুদ্ধদেব বসু	.....	বাবার চিঠি
১০.	সমর সেন	.....	মহুয়ার দেশ
১১.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	.....	আমরা যাবো, পারাপার, কেন এল না
১২.	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	.....	দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে
১৩.	অরুণ মিত্র	.....	তোমার মূর্তি আমি
১৪.	শঙ্খ ঘোষ	.....	দ
১৫.	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	.....	নির্বাসন
১৬.	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	.....	আমি দেখি
১৭.	ভাস্কর চক্রবর্তী	.....	জিরাফ
১৮.	মৃদুল দাশগুপ্ত	.....	ক্রন্দনরতা জননীর পাশে
১৯.	জয় গোস্বামী	.....	নুন
২০.	মল্লিকা সেনগুপ্ত	.....	সাম্প্রদায়িক
২১.	সুকান্ত ভট্টাচার্য	.....	প্রিয়তমাসু
২২.	নবনীতা দেবসেন	.....	দ্বিগ্বিজয়ের রূপকথা
২৩.	শ্রীজাত	.....	অন্ধকার লেখগুচ্ছ

ভারতীয় কবিতা

১.	আইয়াপ্পা পানিকর	.....	শিক্ষার সার্কাস
২.	ভারভারা রাও	.....	ভারভারা রাও কবিতাম

আন্তর্জাতিক কবিতা

১.	বের্টোল্ট ব্রেখট	.....	পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন
২.	পাবলো নেরুদা	.....	তার সঙ্গে

পূর্ণাঙ্গ বই

১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.....	গুরু, ডাকঘর
২.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	.....	আমার বাংলা

নাটক

১.	বিজন ভট্টাচার্য	.....	আগুন
২.	শম্ভু মিত্র	.....	বিভাব
৩.	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	.....	নানা রঙের দিন
৪.	উৎপল দত্ত	.....	ইতিহাসের কাঠগড়ায়
৫.	বাদল সরকার	.....	ভুল রাস্তা
৬.	মনোজ মিত্র	.....	মঞ্চে চিত্রে
৭.	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	.....	মাছি

সাহিত্যানুশীলন

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

বাংলা ক। একাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক গ্রন্থিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক
আনুকূল্যে একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।
বিক্রয়যোগ্য নয়।